

গ বিভাগ খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা খাদ্যের ছয়টি উপাদানের উৎস ও কাজ সম্পর্কে জানব। এছাড়া পরিপাক ও শোষণের গুরুত্ব, মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী, সুস্বাদু খাদ্য পরিকল্পনায় মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠীর ব্যবহার, বিভিন্ন রোগে পথ্য পরিকল্পনা ও পদ্ধতির ধারণা লাভ করব। খাদ্যসামগ্রী যাতে নষ্ট না হয় এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেও খাদ্য সংরক্ষণ করতে জানাও আমাদের জন্য অতি জরুরি।

এ বিভাগ শেষে আমরা

- খাদ্য ও উপাদানগুলোর প্রকারভেদ, উৎস ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য পরিপাক ও শোষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সুস্বাদু খাদ্য ও খাদ্যের মৌলিক গোষ্ঠী বর্ণনা করতে পারব।
- খাদ্য পরিবেশনে পরিমাপের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন রোগের পথ্য ও পথ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- পচনশীলতার ভিত্তিতে খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ করে খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

অষ্টম অধ্যায় খাদ্য উপাদান, পরিপাক ও শোষণ

খাদ্য উপাদানের প্রকারভেদ, উৎস ও কাজ

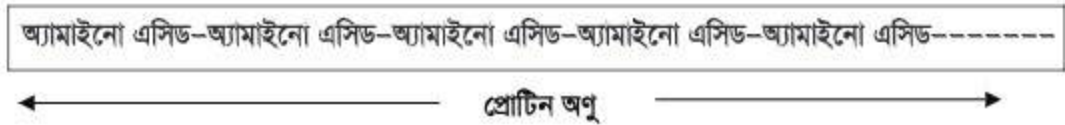
আমরা জানি যে, খাদ্যকে ভাঙলে যে বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসায়নিক উপাদান পাওয়া যায় তাদেরকে খাদ্য উপাদান বলে। এই উপাদানগুলো আমাদের শরীরে পুষ্টি সাধন করে, তাই এদেরকে পুষ্টি উপাদানও বলে। আমাদের খাদ্যে প্রধানত ছয় প্রকারের খাদ্য উপাদান বা পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় যা নিচের ছকে দেখানো হলো।



আমরা এখন উল্লিখিত উপাদানগুলো সম্পর্কে জানব।

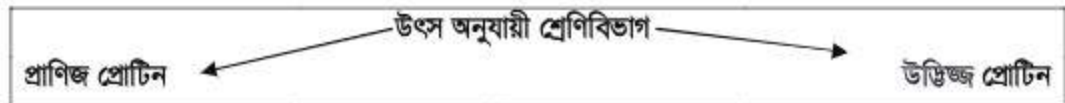
পাঠ ১ – প্রোটিন

প্রোটিন— খাদ্যের ছয়টি উপাদানের মধ্যে প্রোটিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিন ছাড়া কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব না। এজন্য প্রোটিনকে সকল প্রাণের প্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। সব প্রোটিনই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত। প্রোটিনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাঙলে প্রথমে এমাইনো এসিড এবং পরে কার্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। অর্থাৎ অনেক এমাইনো এসিড পাশাপাশি যুক্ত হয়ে একটি প্রোটিন অণু গঠিত হয়। নিচে একটা প্রোটিন অণুর রেখাচিত্র দেখানো হলো।



প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ—

উৎস অনুযায়ী প্রোটিনকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়



(১) প্রাণিজ প্রোটিন- যে প্রোটিনগুলো প্রাণিজগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাণিজ প্রোটিন বলে। যেমন- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি। এই প্রাণিজ প্রোটিনকে প্রথম শ্রেণির প্রোটিন বলা হয়।

(২) উদ্ভিজ্জ প্রোটিন- উদ্ভিদ জগৎ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন বলা হয়। যেমন- ডাল, বাদাম, সয়াবিন, শিমের বিচি ইত্যাদি এই উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন বলা হয়।

প্রোটিনের উৎস-



প্রোটিনজাতীয় খাদ্য।

দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরির ২০ থেকে ২৫ ভাগ প্রোটিনজাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ করা উচিত। প্রতিদিন খাবারে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পাশাপাশি কিছু পরিমাণে প্রাণিজ প্রোটিনও গ্রহণ করতে হবে।

প্রোটিনের কাজ

১। দেহ গঠন ও বৃদ্ধিসাধন - আমাদের দেহের অস্থি, পেশি, বিভিন্ন দেহযন্ত্র, রক্ত কণিকা হতে শুরু করে দাঁত, চুল, নখ পর্যন্ত প্রোটিন দিয়ে তৈরি। প্রোটিন শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি সাধন করে।

২। ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ - আমাদের দেহের কোষগুলো প্রতিনিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়প্রাপ্ত স্থানে নতুন কোষগুলো গঠন করে ক্ষয়পূরণ করতে ও কোনো ক্ষতস্থান সারাতে প্রোটিনের ভূমিকা রয়েছে।

৩। তাপশক্তি উৎপাদন- ১ গ্রাম প্রোটিন থেকে ৪ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। যখন দেহে ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেটের ঘাটতি থাকে তখন প্রোটিন তাপ উৎপাদনের কাজ করে থাকে।

৪। দেহের রোগ প্রতিরোধক শক্তি অর্জন- রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের দেহে তাদের প্রতিরোধী পদার্থ বা অ্যান্টিবডি তৈরি করা প্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৫। মননশক্তির বিকাশ - মানসিক বিকাশ বা মস্তিস্কের বিকাশের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য।

দেহে প্রোটিনের অভাব হলে

- বাড়ন্ত শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে কোয়াশিয়রকর রোগ হয়।
- দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- মেধা কমে যায়।

কাজ-১ দৈনিক যে প্রোটিন জাতীয় খাবারগুলো গ্রহণ করা হয়, তার নাম লেখো।

কাজ-২ তোমার দেহে প্রোটিন কোন কোন কাজ করে থাকে, তা লেখো।

পাঠ ২- কার্বোহাইড্রেট

আমরা দৈনিক যে খাদ্য গ্রহণ করি তার বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের মধ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। শরীরে তাপ ও শক্তি সরবরাহের জন্য এদের গুরুত্ব বেশি। সকল কার্বোহাইড্রেটই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন— এই তিনটি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিভাগ— কার্বোহাইড্রেটকে ভাঙলে সরল চিনি অণু পাওয়া যায়। সরল চিনি অণুর উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১। মনোস্যাকারাইড— যেসব কার্বোহাইড্রেট একটিমাত্র সরল চিনির অণু দিয়ে গঠিত তাকে মনোস্যাকারাইড বলে। যেমন— গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ।

২। ডাইস্যাকারাইড— যেসব কার্বোহাইড্রেটকে ভাঙলে ২টি মনোস্যাকারাইড বা সরল চিনি পাওয়া যায় তাকে ডাইস্যাকারাইড বলে। যেমন— সুক্রোজ, ল্যাকটোজ ও মলটোজ।

৩। পলিস্যাকারাইড— যেসব কার্বোহাইড্রেটকে ভাঙলে ২-এর অধিক একক মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়, তাকে পলিস্যাকারাইড বলে। যেমন— স্টার্চ, গ্লাইকোজেন ও সেলুলোজ।



কার্বোহাইড্রেটের খাদ্য উৎস

নিচে খাদ্যগুলোকে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থেকে কম অনুযায়ী সাজানো হলো—

- ১। চিনি, গুড়, মিছরি, ক্যান্ডি, চকলেট, মিষ্টি
- ২। সাগু, এরাবুট
- ৩। চাল, ভুট্টা, যব, গম
- ৪। আলু
- ৫। বিভিন্ন ধরনের শূকনা ফল যেমন— খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি
- ৬। বিভিন্ন ধরনের ডাল, সয়াবিন, বাদাম
- ৭। টাটকা ফল, আঁড়ুর, কলা, আপেল, আম, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি

দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৫০ থেকে ৬০ ভাগ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ করা উচিত।



বিভিন্ন প্রকার কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য

কার্বোহাইড্রেটের কাজ

- (১) দেহে তাপ বা শক্তি সরবরাহ করাই কার্বোহাইড্রেটের প্রধান কাজ। এজন্য একে জ্বালানি খাদ্য বলে।
১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থেকে ৪ কিলো ক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।
- (২) সেলুলোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।
- (৩) মস্তিষ্কের কাজ সচল রাখার জন্য একমাত্র জ্বালানি হিসাবে গ্লুকোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

দেহে কার্বোহাইড্রেটের অভাব হলে

দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপশক্তির ঘাটতি হয়। ফলে শরীর দুর্বল হয় ও স্বাভাবিক কাজ করার শক্তি কমে যায়।

কাজ ১- তুমি কেন কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করবে, ব্যাখ্যা করো।

পাঠ ৩- স্নেহ পদার্থ

খাদ্যের ছয়টি উপাদানের মধ্যে স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটই সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপন্ন করে। প্রায় সব প্রাকৃতিক খাদ্যবস্তুর মধ্যে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। স্নেহ জাতীয় পদার্থ পানিতে অদ্রবণীয় এবং পানির চেয়ে হালকা।

স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটের শ্রেণিবিভাগ

(ক) বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফ্যাটের শ্রেণিবিভাগ- ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- (১) কঠিন স্নেহ এবং (২) তরল স্নেহ।

(১) কঠিন স্নেহ- যেসব স্নেহ পদার্থ স্বাভাবিক তাপে ও চাপে কঠিন আকৃতির হয় সেগুলোকে কঠিন স্নেহ বলে। যেমন-প্রাণীর চর্বি, মাখন ইত্যাদি।

(২) তরল স্নেহ- যেসব স্নেহ পদার্থ স্বাভাবিক তাপে ও চাপে তরল অবস্থায় থাকে সেগুলোকে তরল স্নেহ বলে। যেমন-সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

খ) উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থের শ্রেণিবিভাগ- উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়- (১) উদ্ভিজ্জ স্নেহ ও (২) প্রাণিজ স্নেহ।

(১) উদ্ভিজ্জ স্নেহ- যেসব স্নেহ পদার্থ উদ্ভিদ জগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদেরকে উদ্ভিজ্জ স্নেহ বলে। যেমন- নারিকেল তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

(২) প্রাণিজ স্নেহ - যেসব স্নেহ পদার্থ প্রাণিজগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাণিজ স্নেহ বলে। যেমন- গরুর চর্বি, ঘি, মাখন, মাছের তেল ইত্যাদি।

খাদ্য উৎস

(১) প্রথম শ্রেণির উৎস- এখানে স্নেহের পরিমাণ ৯০% থেকে ১০০%। সয়াবিন তেল, ঘি, মাখন, সরিষার তেল, কড মাছের তেল বা হাঙর মাছের তেল ইত্যাদি।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণির উৎস- এখানে স্নেহের পরিমাণ ৪০% থেকে ৫০%। বিভিন্ন ধরনের বাদাম যেমন- চীনাবাদাম, কাজুবাদাম, পেস্তাবাদাম, আখরোট, নারিকেল ইত্যাদি।

(৩) তৃতীয় শ্রেণির উৎস- এখানে স্নেহের পরিমাণ ১৫% থেকে ২০%। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, যকৃৎ ইত্যাদি।

আমাদের খাদ্যে দৈনিক ক্যালরির ২০% থেকে ২৫% স্নেহ পদার্থ থেকে গ্রহণ করা উচিত। ফ্যাট বা স্নেহ-জাতীয় খাদ্য প্রয়োজনের চাইতে বেশি খেলে তা শরীরের কোনো কাজে লাগেনা এবং দেহে ফ্যাট আকারে জমা থাকে। যার ফলে দেহের ওজন খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। তাই ফ্যাটজাতীয় খাদ্য বেশি খাওয়া উচিত নয়।



বিভিন্ন প্রকার ফ্যাটজাতীয় খাদ্য

স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটের কাজ—

- ১। স্নেহ পদার্থের প্রধান কাজ হলো তাপ ও শক্তি সরবরাহ করা। ১ গ্রাম স্নেহ পদার্থ থেকে দেহে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।
- ২। দেহে শক্তির উৎস হিসাবে সঞ্চিত থাকে।
- ৩। কোষ প্রাচীরের সাধারণ উপাদান হিসেবে স্নেহ পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ৪। ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে-কে দ্রবীভূত করে দেহে গ্রহণ উপযোগী করে তোলে।
- ৫। দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোকে সংরক্ষণের জন্য স্নেহ পদার্থের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
- ৬। দেহ হতে তাপের অপচয় রোধ করে শরীর গরম রাখে।
- ৭। স্নেহ পদার্থ চর্মরোগের হাত থেকে রক্ষা করে।
- ৮। খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি করে।

ফ্যাটের অভাবে দেহে—

- প্রয়োজনীয় তাপশক্তির ঘাটতি হয়।
- চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলোর ঘাটতি দেখা যায়।
- চর্মরোগ দেখা দিতে পারে।

কাজ ১— তুমি প্রতিদিন যে ফ্যাটজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করো সেই খাবারগুলোর তালিকা করো।

কাজ ২— ফ্যাটজাতীয় খাদ্য তোমার শরীরে কী ধরনের কাজ করে তা লেখো।

পাঠ ৪— ভিটামিন

ভিটামিন হলো খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার জটিল জৈব রাসায়নিক যৌগ যা জীবদেহে খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয়। আবার এদের উপস্থিতি ছাড়া জীবদেহের শক্তি উৎপাদন ক্রিয়া ব্যাহত হয়, সুষ্ঠু স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব হয় না এবং এই যৌগগুলোর অভাবে বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগ দেখা যায়। দেহে এই অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলোর চাহিদা খুব সামান্য। কিন্তু এর কাজকে সামান্য বলা যায় না। কারণ দেহ গঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ প্রতিটি কাজই ভিটামিনের উপস্থিতি ছাড়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

ভিটামিনের শ্রেণিবিভাগ

দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিনগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন— যে ভিটামিনগুলো চর্বিতে বা চর্বি দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় কিন্তু পানিতে অদ্রবণীয় তাদেরকে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বলে। এই ভিটামিন ৪টি, যথা— এ, ডি, ই এবং কে।

(২) পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন— যে ভিটামিনগুলো পানিতে খুব সহজেই দ্রবীভূত হয় কিন্তু চর্বিতে অদ্রবণীয় তাকে পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বলে। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন প্রধানত দুই ধরনের।

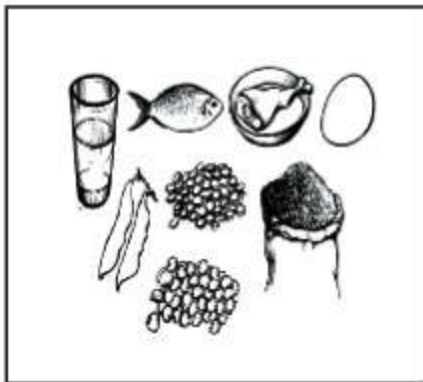
যথা—ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ও ভিটামিন-সি।

ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স— ভিটামিন ‘বি’ কোনো একক ভিটামিন নয়। প্রায় ১৫টি বিভিন্ন ভিটামিনকে একসাথে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স বলা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো থায়ামিন বা বি_১, রিবোফ্লাভিন বা বি_২, ফলিক এসিড।

ভিটামিনের উৎস

প্রাণিজ উৎস— সামুদ্রিক মাছ, ডিমের কুসুম, মাংস, যকৃৎ, পনির, দুধ ও দুধজাতীয় খাদ্য।

উদ্ভিজ্জ উৎস— টেকিছাঁটা চাল, বিভিন্ন ধরনের ডাল, মিষ্টি আলু, বিভিন্ন ধরনের সবুজ শাক, ধনেপাতা, লেটুস পাতা, বিভিন্ন ধরনের সবজি যেমন— টেঁড়স, মাশরুম, পেঁপে, চিচিংগা, লাউ, বেগুন, ধুন্দল, টমেটো, বিট। ওলকপি, ব্রোকলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, বরবটি, মুলা, করলা, উচ্ছে, গমের



ভিটামিনসমৃদ্ধ বিভিন্ন খাদ্য

অঙ্কুর, অঙ্কুরিত ছোলা, মটরশুঁটি, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, কাঁচা কাঁঠাল, বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন— আমলকী, পেয়ারা, আমড়া, আতা, সফেদা, গাব, বরই, কুল, জাম্বুরা, বেল, লেবু, পাকা টমেটো, কমলালেবু, কামরাজা, পাকা পেঁপে, আম, পাকা কাঁঠাল ইত্যাদি।

ভিটামিনের কাজ

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে।
- স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কর্মদক্ষতা ঠিক রাখে।
- চোখ ও ত্বকসহ বিভিন্ন অংশের সুস্থতা রক্ষা করে।
- রক্ত গঠনে সাহায্য করে।
- শরীরে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের যথাযথ ব্যবহার করে স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা অটুট রাখে।

অভাবজনিত রোগ- বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন ধরনের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়।

যেমন-

ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে বেরিবেরি, মুখে ঘা, ঠোঁটের কোনা ফেটে যাওয়া, পেলেগ্রা চর্মরোগ ও মানসিক বিষাদ, এনিমিয়া রক্তক্ষততা ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।

ভিটামিন সি-এর অভাবজনিত রোগ

স্কার্ভি রোগ হয় (দাঁতের মাড়ি ফুলে যায় ও স্পঞ্জের মতো হয় আর রক্ত পড়ে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ-

চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন	অভাবজনিত রোগ
ভিটামিন- এ	রাতকানা রোগ হয় (রাতের বেলায় অল্প আলোতে দেখতে পায় না)।
ভিটামিন- ডি	শিশুদের রিকেট হয় (পায়ের হাড় বেকে যায় ও মাথার খুলি বড় দেখায়) এবং বড়দের অস্টিওম্যালোসিয়া রোগ (হাড় নরম ও ভজ্জুর হয়ে যায় আর বেকে যায়)।
ভিটামিন- ই	প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

কাজ ১- বিভিন্ন ভিটামিনের খাদ্য উৎসের নাম লেখো।

পাঠ ৫- খনিজ লবণ বা ধাতব লবণ

শরীর গঠনে প্রোটিনের পরই মিনারেলস বা খনিজ পদার্থ বা ধাতব লবণের স্থান। দেহের উপাদানের শতকরা প্রায় ৯৬ ভাগ জৈব পদার্থ এবং ৪ ভাগ অজৈব পদার্থ বা খনিজ পদার্থ। দেহে প্রায় ২৪ প্রকার

বিভিন্ন খনিজ পদার্থ রয়েছে। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেশিয়াম, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, আয়োডিন, জিংক, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল ইত্যাদি খনিজ পদার্থ দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এগুলো খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। দীর্ঘদিন খনিজ লবণের ঘাটতিতে নানা প্রকারের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। খাদ্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় ধাতব লবণ পেয়ে থাকি।

শ্রেণি বিভাগ- পরিমাণের মাপকাঠিতে এদের ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) **প্রধান খনিজ লবণ-** অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও গন্ধক প্রাণী দেহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অবস্থান করে। এদের প্রধান খনিজ লবণ বলে।

(২) **লেশ মৌল খনিজ লবণ-** লৌহ, আয়োডিন, ক্লোরিন, জিংক, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, কোবাল্ট, মলিবডেনাম ইত্যাদি খুব সামান্য পরিমাণ দেহের পুষ্টি কাজে অংশ নেয় বলে এসব মৌলকে লেশ মৌল খনিজ লবণ বলা হয়। কিন্তু এগুলো খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও এদের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খনিজ লবণের বিভিন্ন খাদ্য উৎস



খনিজ লবণসমৃদ্ধ খাদ্য

প্রাণিজ উৎস- সামুদ্রিক মাছ, কাঁটাসহ ছোট মাছ, ডিমের-কুসুম, মাংস, যকৃৎ, পনির, দুধ ও দুধ জাতীয় খাদ্য।

উদ্ভিজ্জ উৎস- বিভিন্ন ধরনের সবুজ সবজি ও ফল, টেকিছাঁটা চাল, বিভিন্ন ধরনের ডাল, মিষ্টি আলু ইত্যাদি।

ধাতব লবণ বা খনিজ পদার্থের কাজ- আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাদ্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এই অত্যাবশ্যকীয় পদার্থগুলো আমাদের দেহে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। নিচের ছকে এদের সাধারণ কাজগুলো দেওয়া হলো-

- কঠিন কোষকলা, যেমন-হাড় ও দাঁত গঠন করে
- রক্ত গঠন করে
- হরমোন গঠনে সহায়তা করে
- অভ্যন্তরীণ কাজসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে

বিভিন্ন খনিজ পদার্থের অভাবের ফল

বিভিন্ন প্রকারের খনিজ লবণের অভাবে বিভিন্ন ধরনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন—

খনিজ পদার্থ	অভাবজনিত রোগ
ক্যালসিয়াম	ক্যালসিয়ামের অভাবে শিশুদের রিকেট রোগ হয়, দাঁত ও হাড়ের গঠন ব্যাহত হয়। শিশুদের রিকেট ও বড়দের ওস্টিওম্যালেসিয়া রোগ হয়।
সোডিয়াম	রক্তচাপ কমে যায় ও পেশির দুর্বলতা দেখা দেয়।
পটাশিয়াম	পেশির দুর্বলতা দেখা দেয়।
আয়োডিন	গলগন্ড রোগ হয়।
লৌহ	এনিমিয়া বা রক্ত-স্বল্পতা হয়।
জিংক	শিশুদের বর্ধন ব্যাহত হয়।

কাজ ১— খনিজ লবণসমৃদ্ধ খাদ্য কেন গ্রহণ করা প্রয়োজন তা বর্ণনা করো।

পাঠ ৬— পানি



মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানি অত্যাবশ্যকীয়। মানুষ কয়েক সপ্তাহ খাবার না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু পানি না খেয়ে এক দিনের বেশি থাকতে পারে না। মানুষের দেহ ৫৫% থেকে ৭৫% পানি দ্বারা গঠিত। শরীরের সকল টিস্যুতেই পানি থাকে। প্রতিদিন মল, মূত্র, ফুসফুস ও চামড়ার মাধ্যমে শরীর থেকে পানি বের হয়ে যায় এবং মানুষের দেহ পানি সংরক্ষণ করে রাখতে পারে না।

তাই প্রতিদিনই বিশুদ্ধ পানি পান করতে হয়। কী পরিমাণ পানি পান করতে হবে তা নির্ভর করে কী ধরনের পরিশ্রম করা হচ্ছে, কী খাবার খাওয়া হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ের উপর। প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যায় সেই পরিমাণ পানি পান করা প্রয়োজন। খাবার থেকে প্রায় ১ লিটার পানি পাওয়া যায় এবং বাকিটা তরল পানীয় থেকে পেতে হবে। গড়ে একজন মানুষের প্রতিদিন ২.৫ থেকে ৩ লিটার পানি শরীর থেকে বের হয়ে যায়। খুব বেশি গরম আবহাওয়ায় ও অধিক পরিশ্রমে শরীরে পানি বেশি প্রয়োজন হয়। যারা উড়োজাহাজে ভ্রমণ করেন তাদের ক্ষেত্রে প্রতি ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা উড়োজাহাজে ভ্রমণের জন্য প্রায় ১.৫ লিটার পানি বের হয়ে যায়।



পানির বিভিন্ন খাদ্য উৎস

পানির উৎস- পানির প্রধান উৎস হচ্ছে খাবার পানি, ডাবের পানি, দুধ, ফলের রস, সুপ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পানীয়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রসালো ফল, যেমন- লিচু, জামরুল, তরমুজ ইত্যাদিতেও প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে।

পানির কাজ

- শরীরের প্রতিটি কোষের স্বাভাবিক কাজ বজায় রাখার জন্য পানির প্রয়োজন হয়।
- শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করার জন্য পানির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
- শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে।
- কোষে পুষ্টি উপাদান পরিবহণে সাহায্য করে।

শরীরে পানির পরিমাণ খুব কমে গেলে সেই অবস্থাকে ডিহাইড্রেশন বা পানি স্বল্পতা বলে। এর লক্ষণগুলো হলো মাথাধরা, দুর্বল লাগা, ঠোঁট শুকিয়ে যায় বা ফেটে যায়, মূত্রের রং গাঢ় হলুদ হয়। এই ডিহাইড্রেশনের কারণগুলো হলো -

- অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া, অর্দ্রতা, ব্যায়াম অথবা জ্বরের কারণে ঘাম বেশি হওয়া।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান না করা।
- ডায়রিয়া হওয়া।
- অতিরিক্ত বমি হওয়া।

কখন শরীরে পানির চাহিদা বাড়ে— দিনে ৬ থেকে ৮ গ্লাস পানির প্রয়োজন হয়। তবে পানির চাহিদা নিম্নলিখিত অবস্থায় বেড়ে যায়—

- খুব বেশি গরম আবহাওয়ার কারণে অনেক ঘাম হলে
- জ্বর হলে
- ডায়রিয়া হলে ও বমি হলে
- অনেক বেশি পরিশ্রম করলে, খেলাধুলা করলে বা ব্যায়াম করলে
- খাবারে আঁশজাতীয় খাদ্য বেশি থাকলে পানি বেশি খেতে হয়
- স্তন্যদাত্রী মায়ের পানির চাহিদা বেশি হয়

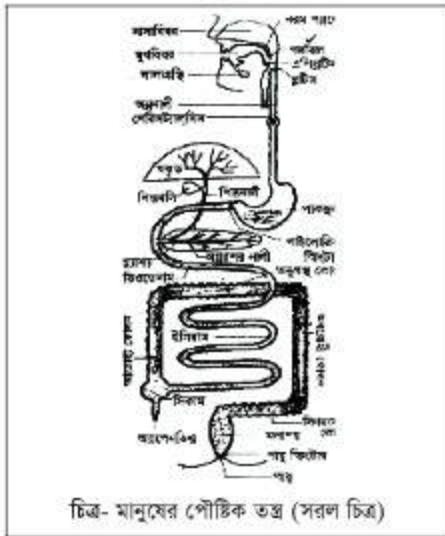
কাজ ১— কোন কোন অবস্থায় পানির চাহিদা বাড়ে?

পাঠ ৭ – খাদ্য পরিপাক ও শোষণের প্রয়োজনীয়তা

আমরা খাবার খাওয়ার দৃশ্যটি চোখে দেখি। বাকি যে কাজগুলো শরীরের ভেতর ঘটে থাকে সেই ঘটনাগুলো আমরা চোখে না দেখলেও অনুভব করি। যেমন— খাবার খাওয়ার ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা পর ক্ষুধা লাগে। খাবার পরিপাক হয়ে শোষিত হয়ে যাওয়ার পর আমাদের ক্ষুধা লাগে। আবার বেশ কিছুদিন সুখম খাদ্য গ্রহণ না করলে শরীরে নানা প্রকার অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। এই বিষয়গুলো থেকে বুঝতে পারি যে, খাবার খাওয়ার পর শরীরের অভ্যন্তরে এমন কিছু কাজ ঘটে থাকে যার ফলে শরীরের পুষ্টি সাধন হয়, আমরা সুস্থ থাকি, আমাদের ক্ষুধা লাগে এবং ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য আবার খাদ্য গ্রহণ করে থাকি।

তাহলে প্রশ্ন আসে, খাওয়ার পর শরীরের মধ্যে কী ঘটে এবং এর পরিণতিতে কী হয়? আমরা যে খাবারগুলো খাই, সেই খাবারের প্রতিটিতেই বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদান থাকে। এই পুষ্টি উপাদানগুলো জটিল অবস্থায় খাদ্যের মধ্যে অবস্থান করে। যে অবস্থায় পুষ্টি উপাদানগুলো খাদ্যের মধ্যে থাকে সেই অবস্থায় শরীরে কোনোভাবেই কাজে লাগতে পারে না বা দেহের পুষ্টিসাধন হয় না। যেমন— আমরা ভাত ও ডাল খেলাম। এই খাবারগুলোর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন, ধাতব লবণ ইত্যাদি জটিল অবস্থায় থাকে। এই জটিল অবস্থায় ভাত বা ডাল সরাসরি শরীরে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং শরীরের কোনো কাজে আসবে না।

শরীরের গ্রহণ উপযোগী হতে হলে প্রথমে ভাত ও ডাল ভেঙে সরল ও শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত হবে। অর্থাৎ এদের মধ্যে অবস্থিত কার্বোহাইড্রেট ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হবে, প্রোটিন ভেঙে এমাইনো এসিডে পরিণত হবে, তারপর এই সরল উপাদানগুলো শোষিত হয়ে শরীরের পুষ্টি সাধন করবে। তাই খাবার খাওয়ার পর তা শরীরের উপযোগী অবস্থায় পরিণত করার জন্য বা গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিণত করার জন্য এবং দেহের কোষগুলোতে পাঠাবার আগের পরিপাক ও শোষণের প্রয়োজন হয়।



পরিপাক— খাবার খাওয়ার পর তা ভেঙে গিয়ে জটিল অবস্থা থেকে সরল অবস্থায় পরিণত হওয়াকে পরিপাক বলে।

শোষণ— পরিপাক হওয়ার পর যে সরল উপাদানগুলো তৈরি হয় সেই উপাদানগুলো যে প্রক্রিয়ায় রক্তস্রোতে প্রবেশ করে তাকে শোষণ বলে।

পরিপাকতন্ত্র— মানবদেহের যে অঙ্গগুলো পরিপাক ও শোষণের কাজ করে থাকে তাদেরকে এক কথায় পরিপাকতন্ত্র বলে।

এই কাজগুলো আমাদের দেহের পরিপাকতন্ত্রে ঘটে থাকে। আমরা যে খাবারগুলো খাই সেগুলোতে পুষ্টি উপাদানগুলো জটিল অবস্থায় থাকে এবং এই জটিল অবস্থায় পুষ্টি উপাদানগুলো শরীরে শোষিত হতে পারে না এবং কোনো কাজে আসে না। কিন্তু যখন খাবারগুলো পরিপাক হয় তখন জটিল পুষ্টি উপাদানগুলো ভেঙে গিয়ে সরল উপাদানে পরিণত হয়। সেই সরল উপাদানগুলো আবার শোষিত না হওয়া পর্যন্ত দেহে কোনো প্রকার কাজ করতে পারে না।



খাদ্য পরিপাক ও শোষণের পরিণতি

ওপরের ছক থেকে বলা যায় যে, জটিল পুষ্টি উপাদানগুলোকে সরল ও শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত করার জন্য পরিপাকের প্রয়োজন হয়। আবার পুষ্টি উপাদানগুলোকে দেহের কোষে কোষে পৌঁছানোর জন্য ও পুষ্টি সাধন করার জন্য শোষণের প্রয়োজন হয়।

কাজ ১— খাবার খাওয়ার পর দেহের অভ্যন্তরে যে প্রক্রিয়া ঘটে তা ধারাবাহিকভাবে লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. খাদ্যের উপাদান কয়টি?

- | | |
|--------|--------|
| ক. ৫টি | খ. ৬টি |
| গ. ৭টি | ঘ. ৮টি |

২. বাড়ন্ত শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কোনটি প্রয়োজন?

- | | |
|-------------------|-------------|
| ক. কার্বোহাইড্রেট | খ. প্রোটিন |
| গ. স্নেহ পদার্থ | ঘ. খনিজ লবণ |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিতার বয়স আট বছর। সে শুধু সবজি দিয়ে ভাত খেতে পছন্দ করে। রিতা তার সমবয়সীদের সাথে খেলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠে। লেখাপড়ায় তেমন আগ্রহ নেই। তার মা তাকে কোনো কাজ করতে বললে সেটি সে করতে চায় না। সব ব্যাপারে রিতার এ অনগ্রহ তার পরিবারকে ভাবিয়ে তোলে।

৩. রিতার খাদ্যে কোন উপাদানের অভাব রয়েছে?

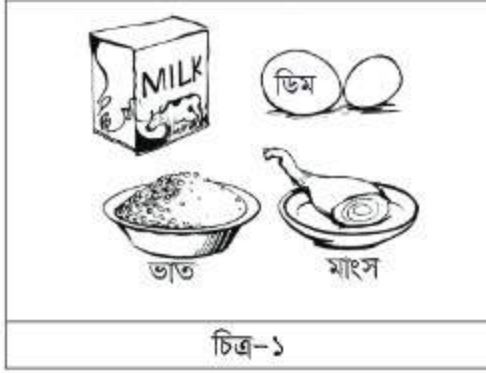
- | | |
|-------------------|-------------|
| ক. প্রোটিন | খ. খনিজ লবণ |
| গ. কার্বোহাইড্রেট | ঘ. পানি |

৪. রিতার দৈনন্দিন খাদ্যে নিচের কোন তালিকাটিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত—

- | | |
|------------------------------|--|
| ক. খেজুর, কিশমিশ, কলা, আনারস | খ. ডাল, বাদাম, সয়াবিন, শিমের বিচি |
| গ. তেল, ঘি, মাখন, নারিকেল | ঘ. সামুদ্রিক মাছ, কলিজা, পনির, ডিমের কুসুম |

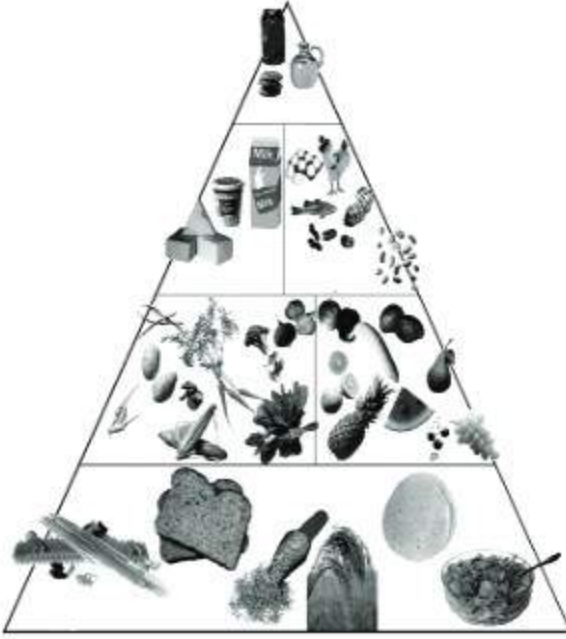
সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.



- ক. ভিটামিন কী?
- খ. পরিপাকতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কী?
- গ. ১ নং চিত্রের খাদ্যগুলো মানবদেহে কোন ধরনের কাজ করে? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. তুমি কি মনে করো ২ নং চিত্রের খাদ্যগুলো প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প পরিমাণে গ্রহণের ফলে মানবদেহে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
২. দশ বছরের চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে তানহা। দুই থেকে তিন দিন হলো তার জ্বর ভালো হয়েছে। কিন্তু সে পড়ালেখা করতে পারছে না। অধিকাংশ সময় শূয়ে কাটায়। তার মা তাকে দুধ, পুডিং, সেমাই, কলিজা ও ডাল জাতীয় খাবার বেশি করে খেতে দেন।
- ক. পরিপাক কী?
- খ. ডায়রিয়া হলে শরীরে ডিহাইড্রেশন হয় কেন?
- গ. মা তানহাকে যে খাদ্যগুলো খেতে বলে সেগুলো কোন জাতীয় খাদ্য উপাদান?
- ঘ. তানহার বর্তমান অবস্থা উত্তরণের জন্য মায়ের দেওয়া খাদ্যগুলো কতটুকু উপযোগী? ব্যাখ্যা করো।

নবম অধ্যায় মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী



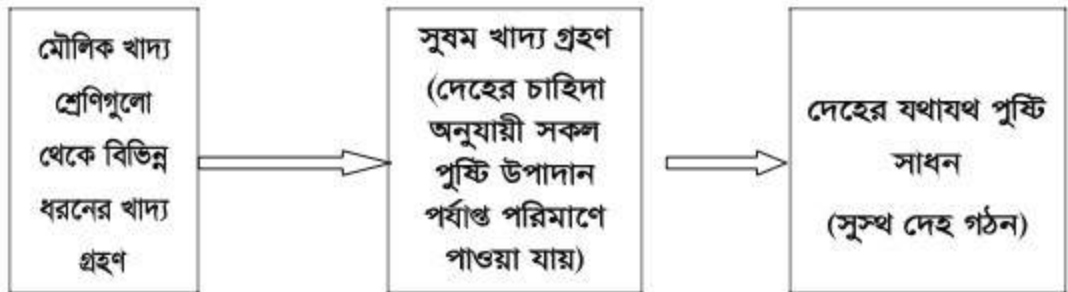
মৌলিক খাদ্যশ্রেণি

বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই খাদ্য যদি সঠিক পরিমাণে শরীরের চাহিদা অনুযায়ী গ্রহণ করা না হয় তা হলে শরীরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন- খাবার যদি শরীরের চাহিদার চেয়ে বেশি খাওয়া হয় তা হলে শরীর মোটা হয়ে যাবে। আবার যদি শরীরের চাহিদার চেয়ে খাবার কম খাওয়া হয় তাহলে শরীর শুকিয়ে যাবে। এছাড়া একই খাদ্য যদি প্রতিদিন খাওয়া হয় তা হলে সেই খাবার কিছুদিন পরে আর খেতে ভালো লাগবে না। তাই প্রতিদিনের খাদ্য হওয়া চাই শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত, পুষ্টিকর ও একঘেয়েমিমুক্ত এবং

রুচিকর। খাদ্যকে সুস্বাদু করতে হলে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি এই ছয়টি পুষ্টি উপাদানই উপযুক্ত অনুপাতে অর্থাৎ শরীরের চাহিদা অনুযায়ী বর্তমান থাকা প্রয়োজন। এসব খাদ্য উপাদান আবার বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। কোনো খাদ্যে একটা আবার কোনো কোনো খাদ্যে একাধিক পুষ্টি উপাদান থাকে। সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ করতে হলে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে খাদ্য নির্বাচন করে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। তাই পুষ্টি বিশেষজ্ঞগণ খাদ্যগুলোকে কয়েকটি মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এই প্রতিটি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত খাদ্যগুলোতে পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্যতার পরিমাণ প্রায় একই। অর্থাৎ একটা খাদ্যশ্রেণিতে যে খাদ্যগুলো থাকে সেই খাদ্যগুলো থেকে প্রায় সমপরিমাণ পুষ্টি পাওয়া যাবে, তাই একই শ্রেণির একটা খাদ্যের পরিবর্তে সেই শ্রেণির অন্য একটা খাদ্য খাওয়া যাবে। এতে করে পুষ্টির প্রাপ্যতা ঠিক থাকবে খাদ্য গ্রহণে বৈচিত্র্যও আসবে। এভাবে খাদ্যের মৌলিক শ্রেণিগুলো থেকে খাদ্য গ্রহণের ফলে অতি সহজেই প্রতিটি খাদ্য উপাদান বা পুষ্টি উপাদানগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া যায়।

পাঠ ১ – মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠীর সম্ভা : দৈহিক পুষ্টি ও পরিশ্রমের জন্য প্রতিদিন খাদ্যের প্রয়োজন হয়। একজন সুস্থ-সবল ব্যক্তির কী পরিমাণ খাওয়া দরকার, কতটুকু খাবার খেলে শরীর সুস্থ রাখা যাবে, মোটা হওয়া রোধ করা যাবে, আবার শরীর শুকিয়ে যাবে না, খাদ্যদ্রব্যের কোনটি কী পরিমাণে গ্রহণ করলে দেহে খাদ্য উপাদানের অনুমোদিত চাহিদা পূরণ করা যায় তা নির্ণয়ের জন্য সমস্ত খাদ্যকে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। খাদ্যের উপাদান এবং দেহে খাদ্যের কার্যকারিতার ওপর ভিত্তি করে সব শ্রেণির খাদ্যের সমন্বিত সুখম খাদ্য পরিকল্পনা করার জন্য খাদ্যসমূহকে কতগুলো মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এদেরকে মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী বা মৌলিক খাদ্যশ্রেণি বলে।

মৌলিক খাদ্যশ্রেণিগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণের ফলে সহজে সুখম খাদ্য গ্রহণ সম্ভব হয়, এর ফলে দেহের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিসাধন ঘটে।



মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা

- খাদ্য সুখম হতে হলে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি—এই ছয়টি পুষ্টি উপাদানই উপযুক্ত অনুপাতে খাদ্যে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। তাই মৌলিক খাদ্যশ্রেণির মাধ্যমে খাদ্য নির্বাচন করে খাদ্য গ্রহণ করলে খাদ্য সহজেই সুখম হবে।
- মৌলিক খাদ্যশ্রেণি থেকে প্রতিদিনের খাদ্য নির্বাচন করলে শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত পরিমাণে এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা সহজ হবে।
- খাদ্যকে একঘেয়েমি মুক্ত এবং রুচিকর করে পরিবেশন করার জন্য এর ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম।

খুব সহজে অল্প সময়ের মধ্যে সশ্রমী মূল্যে সুখম খাদ্য তালিকা তৈরির জন্য মৌলিক খাদ্য শ্রেণির গুরুত্ব রয়েছে।

কাজ ১– সুখম খাদ্য গ্রহণের জন্য মৌলিক খাদ্য শ্রেণির ভূমিকা লেখো।

পাঠ - ২ মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ

পূর্বের পাঠে আমরা মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী কী এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জেনেছি। এই পাঠে জানব বিভিন্ন ধরনের খাদ্যকে কয়টি মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠীতে বা মৌলিক খাদ্য শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যকে ৫টি মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। নিচের ছকে এই গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত খাদ্যগুলোর নাম এবং প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো –

নিচে মৌলিক শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত খাদ্যগুলোর নাম ও প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলো দেওয়া হলো

মৌলিক খাদ্যশ্রেণি	খাদ্যের নাম	প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান
শস্য জাতীয় খাদ্যশ্রেণি (শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য-শ্রেণি)	ভাত, রুটি, সুজি, সেমাই, নুডলস, আলু ইত্যাদি	খাদ্যশক্তি, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন বি _১ , ভিটামিন বি _২
শাকসবজি ও ফল জাতীয় খাদ্যশ্রেণি (রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্যশ্রেণি)	বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ও ফল ইত্যাদি	সেলুলোজ, ভিটামিন-বি, ভিটামিন- সি, ক্যারটিন, ফলিক এসিড, বিভিন্ন খনিজ পদার্থ- ক্যালসিয়াম, গৌহ, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি
মাছ, মাংস, ডাল ও বিচি জাতীয় খাদ্যশ্রেণি (দেহ গঠনকারী ও ক্ষয়পূরণকারী খাদ্যশ্রেণি)	ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ডাল বাদাম ইত্যাদি	খাদ্যশক্তি, প্রোটিন, ভিটামিন বি _১ , ভিটামিন বি _২ , ফলিক এসিড, ভিটামিন বি _{১২} , ভিটামিন-এ, আয়রন, ক্যালসিয়াম
দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যশ্রেণি (শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য শ্রেণি)	দুধ, দই, ছানা, ঘোল, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি, ফির, পায়েস ইত্যাদি	প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ল্যাকটোজ, ভিটামিন-এ, ভিটামিন বি _১ , ভিটামিন বি _{১২}
স্নেহ বা তেল ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্যশ্রেণি	স্নেহ বা তেল-বিভিন্ন ধরনের ভোজ্য তেল, ঘি, মাখন ডালডা ইত্যাদি মিষ্টি-চিনি, গুড় ও মিষ্টি জাতীয় খাবার	প্রধানত ঘনীভূত শক্তির বা ক্যালরির উৎস ও চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো পাওয়া যায়
		
শস্য ও শস্যজাতীয় খাদ্যশ্রেণি		শাকসবজি ও ফলজাতীয় খাদ্যশ্রেণি
		
মাছ, মাংস, ডাল ও বিচি জাতীয় সমৃদ্ধ খাদ্যশ্রেণি	স্নেহ ও মিষ্টিজাতীয় খাদ্যশ্রেণি	দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যশ্রেণি

কাজ ১- তুমি গতকাল সারাদিনে যে খাবারগুলো খেয়েছ সেই খাবারগুলো কোন কোন মৌলিক খাদ্য শ্রেণিভুক্ত তা লেখো।

পাঠ ৩- পরিবেশন পরিমাণ

আমরা প্রতিদিন যে খাবারগুলো খাই, সেগুলোর পুষ্টিমূল্য হিসাব করার সুবিধার জন্য এবং দেহের চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টি পাওয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি খাবার নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিবেশন করা প্রয়োজন হয়। প্রতিটি খাবার পরিবেশনের জন্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণের খাবার নির্ধারণ করা হয় তাকে এক পরিবেশন পরিমাণ খাদ্য বলা হয়। বিভিন্ন খাদ্যের জন্য এক পরিবেশন পরিমাণ ভিন্ন হয়।

১। শস্য ও শস্য জাতীয় খাদ্যশ্রেণি- শক্তি প্রদানকারী সমস্ত খাদ্যের মধ্যে শস্য ও শস্যজাতীয় খাদ্য থেকেই আমরা মোট ক্যালরির অর্ধেকের বেশি পেয়ে থাকি। আমাদের প্রতিবেলার খাবারে শস্যজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকায় চাল, গম, আলু উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন সরবরাহ করে।

এক পরিবেশন শস্যজাতীয় খাদ্য	
খাদ্যের নাম	পরিমাণ
ভাত	১/২ কাপ
রুটি	মাঝারি ১টা
পাউরুটি	১ স্লাইস

শস্য জাতীয় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ খাদ্য গ্রহণকারীর পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে। এই শ্রেণির খাদ্য গ্রহণ ক্যালরি চাহিদার ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। এই শ্রেণি থেকে প্রতিবেলার খাবারে পরিশ্রমী ব্যক্তির একের অধিক পরিবেশন খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২। শাকসবজি ও ফলজাতীয় খাদ্যশ্রেণি - উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় শাকসবজি ও ফল এই শ্রেণির খাদ্য। প্রাপ্তবয়স্ক স্বাভাবিক পরিশ্রমী ব্যক্তির দৈনিক ৩০০ থেকে ৫০০ গ্রাম শাকসবজি ও ফলমূল গ্রহণ করা দরকার। প্রতিদিন তিন বেলায় আহারে ৪ থেকে ৬ পরিবেশন শাকসবজি, ফল দেহের পরিপুষ্টির জন্য অপরিহার্য।

এক পরিবেশন শাকসবজি জাতীয় খাদ্য	
খাদ্যের নাম	পরিমাণ
কাঁচা শাকসবজি	৫০ গ্রাম
ফল	৫০ গ্রাম

প্রত্যেক পরিবেশনের পরিমাণ ভক্ষণযোগ্য কাঁচা শাকসবজি বা ফল কমপক্ষে ৫০ গ্রাম। বাকি ২ থেকে ৪ পরিবেশন অন্যান্য সবজি ও ফল থেকে গ্রহণ করা দরকার। এই শ্রেণির খাদ্য থেকে প্রতিবেলার খাবারে পরিশ্রমী ব্যক্তির একের অধিক পরিবেশন খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩। মাছ, মাংস, ডাল ও বিচিজাতীয় খাদ্যশ্রেণি- এই খাদ্যশ্রেণি থেকে দৈনিক ৬০ থেকে ১২০ গ্রাম খাদ্য গ্রহণ করে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করা যায়। আহারে প্রোটিন বহুল খাদ্য থেকে খাদ্য পরিবেশনের পরিমাণ

৩০ থেকে ৬০ গ্রাম। প্রতিদিন প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন উভয় শ্রেণি থেকেই প্রয়োজনীয় প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত।

প্রোটিনজাতীয় খাদ্য পরিবেশনের পরিমাণ	
খাদ্যের নাম	গ্রহণযোগ্য পরিমাণ
মাছ, ছোট বা বড়	৩০-৫০ গ্রাম
গরু বা খাসির মাংস	৩০-৫০ গ্রাম
হাঁসের বা মুরগির ডিম	১ টা
মসুর বা অন্যান্য ডাল	২৫ গ্রাম
চিনাবাদাম	২৫ "

দৈনিক কমপক্ষে এক পরিবেশন প্রাণিজ প্রোটিন আহারে থাকা বাঞ্ছনীয়। সন্তানসম্ভবা মা, প্রাকবিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়গামী শিশুর খাদ্যে প্রাণিজ প্রোটিন অত্যাৱশ্যক।

৪। **দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যশ্রেণি:** শিশুদের জন্য এই শ্রেণির খাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধই যথেষ্ট। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক খাদ্যে দুধ অপরিহার্য নয় তবে ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণের জন্য দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাবার খুবই ভালো উৎস। শিশুদের পরিপূরক খাদ্যের সঙ্গে বয়স অনুপাতে দৈনিক ২০০ থেকে ৬০০ মিলিলিটার দুধের প্রয়োজন হয়। এক পরিবেশনে টাটকা তরল দুধের পরিমাণ ২০০ মিলিলিটার। বিদ্যালয়গামী শিশুরা দৈনিক কমপক্ষে এক পরিবেশন এবং

দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য এক পরিবেশনের পরিমাণ		
খাদ্যের নাম	পরিমাণ	
টাটকা তরল দুধ	২০০ মিলিলিটার	১ গ্লাস
ছানা	৫০ গ্রাম	১/২ কাপ
দই	১০০ গ্রাম	১/২ কাপ
পনির	২৫ গ্রাম	২ টে. চামচ

বেশিরপক্ষে ২ পরিবেশন দুধ বা দুধে তৈরি খাবার গ্রহণ করলে তাদের উচ্চমানের প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও রিবোফ্লাভিনের চাহিদা পূরণ হয়।

৫। **তেল ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্যশ্রেণি-** স্নেহ বা তেল ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্য খুবই কম পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। কারণ এই খাবারগুলো খুব বেশি পরিমাণে খেলে খুব তাড়াতাড়ি শরীরের ওজন বেড়ে যাবে। এজন্য রান্নায় যতটা সম্ভব কম পরিমাণে তেল ব্যবহার করা উচিত এবং মিষ্টিজাতীয় খাদ্য কম পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত।

কাজ- ১ তুমি প্রতিদিন যে খাবারগুলো গ্রহণ করো সেই খাবারগুলোর এক পরিবেশন পরিমাণ উল্লেখ করো।

পাঠ ৪ – সুষম খাদ্য পরিকল্পনায় মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠীর ব্যবহার

সুষম খাদ্য- দেহে যে ৬টি খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন তা ৫টি শ্রেণির বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। একজন ব্যক্তির দেহের স্বাভাবিক পুষ্টির জন্য বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানবহুল যেসব খাদ্য যে পরিমাণে

গ্রহণ করা প্রয়োজন সেই পরিমাণ খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলা হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন খাদ্য যে পরিমাণে গ্রহণ করলে কোনো ব্যক্তির দেহের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় তাকে সুষম খাদ্য বলে। সুষম খাদ্য দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশক্তি, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও পানি সরবরাহ করে। সুষম খাদ্যে কোনো পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি বা আধিক্য থাকে না। মাছডাল, ভাতরুটি, শাকসবজি ও ফল, দুধ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণির খাদ্য নিয়েই খাবার সুষম হয়।

সুষম খাদ্য পরিকল্পনায় মৌলিক খাদ্যশ্রেণির ব্যবহার

- ১। খাবারে ৫টি মৌলিক শ্রেণির খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করে ৬টি পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়।
- ২। প্রত্যেক শ্রেণির খাদ্য পরিবেশন পরিমাণ জানা থাকায় খুব সহজেই পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য নির্বাচন করা যায়।
- ৩। দৈনিক মোট ক্যালরির ৫০% থেকে ৬০% কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য গ্রহণের জন্য শস্য ও শস্যজাতীয় খাদ্য নির্ধারিত পরিমাণ গ্রহণ করা এবং ২০ গ্রাম গুড় বা চিনি জাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ করা।
- ৪। দৈনিক মোট ক্যালরির ২০% প্রোটিনজাতীয় খাদ্য গ্রহণ ও দেহে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্য মৌলিক খাদ্যশ্রেণির মাছ, মাংস, ডাল ও বিচিজাতীয় খাদ্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে গ্রহণ করলে সহজেই খাদ্য সুষম হবে। এক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পাশাপাশি কমপক্ষে এক পরিবেশন প্রাণিজ প্রোটিন নির্বাচন করতে হবে।
- ৫। দৈনিক মোট ক্যালরির ২০% থেকে ৩০% ফ্যাটজাতীয় খাদ্য থেকে পুষ্টি উপাদান প্রাপ্তির জন্য দৈনিক মাথাপিছু ২০ থেকে ৩০ গ্রাম তেল (রান্নায়) গ্রহণ করা।
- ৬। ভিটামিন ও ধাতব লবণের দৈনিক চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ও ফল প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিবেশন নির্বাচন করতে হবে। এজন্য মৌলিক খাদ্যশ্রেণির শাকসবজি ও ফলজাতীয় খাদ্যশ্রেণি থেকে শাক, অন্যান্য সবজি রান্না করে এবং রঙিন সবজি রান্না করে এবং রঙিন ফল, টকজাতীয় ফল, রসাল ফল ইত্যাদি মিশ্রিত করে গ্রহণ করতে হবে।

শস্যজাতীয় খাদ্যশ্রেণি	শাকসবজি ও ফলজাতীয় খাদ্যশ্রেণি	মাছ, মাংস, ডাল ও বিচি জাতীয় সমৃদ্ধ খাদ্যশ্রেণি	দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যশ্রেণি	তেল ও মিষ্টিজাতীয় খাদ্যশ্রেণি
৫টি খাদ্যশ্রেণি থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচন				



শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করার জন্য, চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত ক্যালরি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য, চাহিদার চেয়ে খাওয়া যাতে কম বা বেশি না হয় সেজন্য এবং অপুষ্টি প্রতিহত করার জন্য সুখম আহার গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারের এক দিনের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা

পরিবারের সদস্যদের সুখম আহার পরিবেশনের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা করে নেওয়া উচিত। পরিবারের এক দিনের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা করার সময় মৌলিক ৫টি খাদ্যশ্রেণি থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে। এছাড়া পরিবারের সকল বয়সের সদস্যদের জন্য উপযোগী খাদ্য নির্বাচন করতে হবে। একই খাদ্য বারবার গ্রহণ করলে খাদ্য গ্রহণে অস্বাদ ও অরুচি তৈরি হয়, তাই একটা খাদ্যশ্রেণি থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পরিমাণ ঠিক রেখে খাদ্য নির্বাচন করলে খাদ্য গ্রহণে বৈচিত্র্য আসবে এবং খাদ্য সুখম হবে।

কাজ ১- পাঁচটি মৌলিক খাদ্যশ্রেণি ব্যবহার করে নিচের ছকে পরিবারে এক দিনের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা করো।

প্রাতরাশ (সকালের নাশতা)	মধ্যাহ্ন ভোজ (দুপুরের খাবার)	নৈশ ভোজ (রাতের খাবার)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণের ভালো উৎস—

- | | |
|----------|--------------------------|
| ক. মাছ | খ. দুধ ও দুধজাতীয় খাবার |
| গ. বাদাম | ঘ. ডাল |

২. নিম্নের খাদ্যগুলোর মধ্যে কোন খাদ্য থেকে সেলুলোজ পাওয়া যায়?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক. গরুর মাংস | খ. লাউশাক |
| গ. চিনাবাদাম | ঘ. ভুট্টার খই |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৩ বছর বয়সি নাফিস ডাল দিয়ে ভাত খেতে পছন্দ করে। মাছ ও মাংস খেতে চায় না বললেই চলে। দুধ কিংবা দুধজাতীয় খাবারের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই।

৩. নাফিসের দেহে নিচের কোনটির অভাব দেখা দেবে?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. আয়োডিন | খ. রিবোফ্লাভিন |
| গ. স্কোভেল | ঘ. স্টার্চ |

৪. উদ্দীপকে উল্লেখিত খাদ্যাভ্যাসের ফলে নাফিসের—

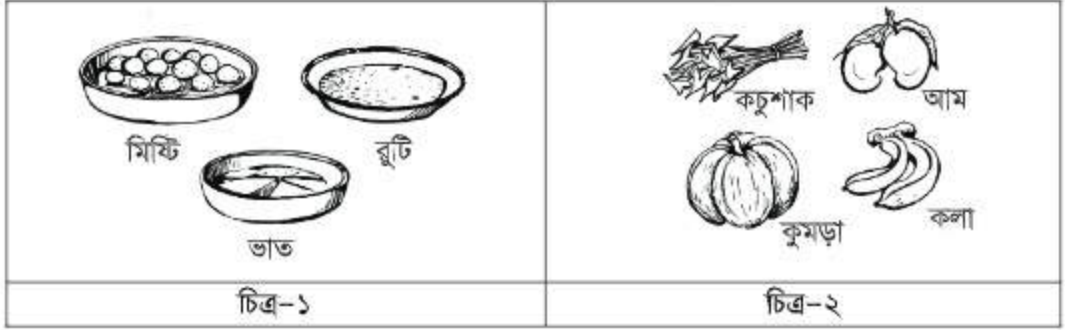
- ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগে ভুগবে
- অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগবে
- মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হবে

নিচের কোনোটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.



- ক. বিভিন্ন ধরনের খাদ্যকে কয়টি মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়?
- খ. দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় কেন?
- গ. ১ নং চিত্রের খাদ্যগুলো থেকে আমরা কী ধরনের পুষ্টি উপাদান পেয়ে থাকি- ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. দেহের পুষ্টিসাধনে ২ নং চিত্রের খাদ্যগুলোর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো।

২.



- ক. দৈনিক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যে কতটুকু গুড় বা চিনি না থাকলে ক্যালরির ঘাটতি হয়?
- খ. শস্যজাতীয় খাদ্য আমাদের দেহের মোট ক্যালরির কতটুকু পূরণ করে? বুঝিয়ে লেখো।
- গ. চিত্রের খাদ্যগুলো ব্যবহার করে ১৩ বছর বয়সি একজন ছাত্রীর দুপুরবেলার খাদ্য পরিকল্পনা করো।
- ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত খাদ্যগুলো পরিবারের সকল সদস্যের শরীরের চাহিদা অনুযায়ী ক্যালরি সরবরাহ নিশ্চিত করে- তুমি কি একমত? সপক্ষে যুক্তি দাও।

দশম অধ্যায়

রোগীর পথ্য ও পথ্য পরিকল্পনা

পাঠ ১ – রোগীর পথ্য

পথ্য কী? স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থাতে খাদ্য গ্রহণে সাধারণত কোনো ধরনের বিধিনিষেধ থাকে না। কিন্তু কোনো কোনো রোগের কারণে শরীরে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে যার ফলে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কখনো কখনো কোনো বিশেষ নির্দেশনা থাকতে পারে। কোনো বিশেষ ধরনের খাদ্য গ্রহণে বিধিনিষেধ হতে পারে। এমনকি খাদ্যে কোনো বিশেষ পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানোর প্রয়োজনও হতে পারে। কোনো রোগে আক্রান্ত হলে তাড়াতাড়ি সেয়ে উঠার জন্য বা রোগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে বিশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী খাবার গ্রহণ করা হয় তাকে পথ্য বলে। যেমন— ডায়রিয়া হলে যে বিশেষ নির্দেশনা মেনে খাদ্য গ্রহণ করা হয় তাকে ডায়রিয়ার পথ্য বলা হবে।

অসুস্থ অবস্থা	→ ওষুধের পাশাপাশি সঠিক পথ্য গ্রহণ করা	→ রোগের কারণে জটিলতা হয় না ও তাড়াতাড়ি শরীর সুস্থ হয়ে উঠে
অসুস্থ অবস্থা	→ ওষুধের পাশাপাশি সঠিক পথ্য গ্রহণ না করা	→ রোগের কারণে জটিলতা বাড়ে ও শরীর সুস্থ হয়ে উঠতে দেরি হয়

পথ্যের গুরুত্ব

(১) যথাযথ পথ্য গ্রহণ ছাড়া শুধু ওষুধ সেবনে অধিকাংশ রোগ থেকেই স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসা কঠিন। অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ পথ্য ছাড়া রোগ নিয়ন্ত্রণ কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

(২) রোগের জটিলতা ও তীব্রতা কমিয়ে আনার জন্য যথাযথ পথ্য গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) রোগের কারণে শরীরের যে সকল পুষ্টি ও শক্তির ক্ষয় হয় সেই সকল ক্ষয় পূরণে সাহায্য করে।

পথ্য নির্বাচন ও পরিকল্পনা— যে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পথ্য নির্বাচন ও পরিকল্পনার সময় কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়। বিষয়গুলো হচ্ছে—

- রোগের প্রকৃতি বা ধরন— রোগটি কোনো সংক্রমণ জনিত রোগ, নাকি বিপাকজনিত রোগ অথবা দীর্ঘমেয়াদী বা তীব্র কিনা ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে।
- রোগের কারণে রোগীর দেহে কোনো জটিলতা তৈরি হয়েছে কিনা।
- রোগীর বয়স— শিশুদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ রোগীর চাইতে পথ্যের ধরনে পার্থক্য থাকতে পারে। আবার প্রাপ্তবয়স্কের থেকেও বৃদ্ধ রোগীর পথ্যের ধরনে পার্থক্য থাকতে পারে।
- রোগের কারণে খাদ্য গ্রহণে বিধি নিষেধ রয়েছে। যেমন— কোনো কোনো রোগের কারণে আঁশজাতীয় খাবার কম খেতে বলা হতে পারে।

- চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত ওষুধ গ্রহণের সাথে খাদ্যের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন- ডায়াবেটিস রোগের কারণে যারা ইনসুলিন নেন তাদের জন্য ইনসুলিন গ্রহণের কারণে খাবারের সময়, পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ থাকে।
- বিশেষ কোনো রোগে বিশেষ কোনো পুষ্টি উপাদানের গ্রহণ বৃদ্ধি বা কমানোর প্রয়োজন রয়েছে। যেমন- উচ্চ রক্তচাপ হলে খাবারে লবণের পরিমাণ কমাতে বলা হয়।
- অপুষ্টিজনিত সমস্যা থাকলে তার অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। যেমন- কোনো রোগীর রক্তশুদ্ধতা থাকলে তার পথ্য পরিকল্পনার সময় যে খাবার খেলে শরীরে রক্ত গঠনের জন্য সহায়ক হবে সেই খাবারগুলো খাদ্য তালিকায় যুক্ত করতে হবে।
- কোনো বিশেষ খাদ্যে এলার্জি বা খাদ্যের কারণে রোগীর জটিলতা তৈরির আশঙ্কা আছে কি না। যেকোনো রোগে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে একজন রোগীর জন্য পথ্য নির্বাচন ও পরিকল্পনা করলে তা রোগ সারাতে বা রোগের কারণে সৃষ্ট জটিলতা উপশমে সহায়ক হবে। একজন অসুস্থ হলে ডাক্তার যেমন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করে থাকেন তেমনি অসুস্থ রোগীকে পথ্যবিদ বা পুষ্টিবিদ পথ্য ও পুষ্টি বিষয়ক নির্দেশনা দিয়ে রোগ সারাতে সহায়তা করে থাকেন।

কাজ ১- তোমার বাসায় কেউ অসুস্থ হলে তুমি তার পথ্য পরিকল্পনার সময় কোন কোন বিষয় বিবেচনা করবে?

পাঠ ২- বিভিন্ন রোগের পথ্য

জ্বর ও ডেঙ্গু জ্বরে পথ্য- জ্বর নিজে কোনো রোগ নয় তবে সাধারণত কোনো ভাইরাস বা অন্য কোনো সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট রোগলক্ষণ হিসেবে জ্বর হয়। জ্বরে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এর সাথে মাথাব্যথা, মাথাধরা, অরুচি, বমি বমি ভাব ও বমি ইত্যাদি লক্ষণ থাকতে পারে। জ্বরে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হয়ে যায়, এছাড়া যথেষ্ট পরিমাণে শক্তির ক্ষয় হয়। তাই জ্বর হলে পানি ও শক্তির চাহিদা বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন জ্বরে ভুগলে পানি ও শক্তির চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের চাহিদাও বেড়ে যায়। ডেঙ্গু জ্বর এডিস মশার মাধ্যমে সংক্রমিত ভাইরাসজনিত জ্বর। ডেঙ্গু জ্বর হলে দেহের তাপমাত্রা অনেক বেশি হতে পারে। যেকোনো জ্বরের মতো ডেঙ্গু জ্বরেও শরীরের জন্য পানি ও শক্তির চাহিদা বেড়ে যায়। সেই সাথে প্রোটিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা বাড়ে।

পথ্যের ধরন

- উচ্চ শক্তিদায়ক, উচ্চ প্রোটিনযুক্ত, কম ফ্যাটযুক্ত খাবার দিতে হবে।
- সব খাবারই খাওয়া যাবে। তবে হজমে সমস্যা হলে লঘুপাক খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। শরীরের তাপমাত্রা বেশি হলে অল্প আঁশযুক্ত খাদ্য নরম করে রান্না করে ভাত, খিচুড়ি বা পিশপাশ, নরম ও অল্প আঁশযুক্ত সবজি, আলু দেওয়া যায়। এছাড়াও নরম সুজি, পুডিং এবং কলা, পেঁপে, কমলা, আপেল ইত্যাদি দেওয়া যায়।
- প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য দুধ, ডিম, কম তেলযুক্ত মাছ, মুরগি ও ডাল দেওয়া যায়। ডেঙ্গু জ্বর হলে প্রোটিনের চাহিদা বেড়ে যায়।
- যথেষ্ট পরিমাণে পানীয় যেমন-দুধ, শরবত, ফলের রস, ডাবের পানি, সুপ ইত্যাদি খেতে হবে।
- টকজাতীয় ফল যেমন- আমলকী, লেবু, জাম্বুয়া ইত্যাদি দিতে হবে।
- জ্বর বেশি হলে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পরপর অল্প অল্প করে খাবার দিতে হবে।

যে খাবার বাদ দেওয়া উচিত

- মাখন, ঘি ও বেশি তৈলাক্ত খাদ্য।
- ডিপ ফ্রায়ড খাবার যেমন- সিংগারা, সমুচা, চিকেন ফ্রাই ইত্যাদি।
- অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার ও আঁশযুক্ত খাদ্য।
- বেকারির খাবার যেমন- পেস্ট্রি, ক্রিম কেক ইত্যাদি।
- সফট ড্রিংকস।

ডায়রিয়া ও আমাশয়ে পথ্য— খাবার ও পানির মাধ্যমে পরিপাকতন্ত্রে জীবাণুর সংক্রমণের ফলে ডায়রিয়া ও আমাশয় হয়ে থাকে। শিশুরাই আক্রান্ত হয় বেশি। তবে বড়রাও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ডায়রিয়া হলে পাতলা মল নির্গত হয়, সাথে জ্বর, বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা ও বমি থাকতে পারে। যেহেতু এই রোগের কারণে পরিপাকতন্ত্র সরাসরি আক্রান্ত হয় ও পাতলা পায়খানার কারণে শরীর থেকে পানি ও লবণ বের হয়ে যায়, তাই পথ্য পরিকল্পনায় অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে। আমাশয় হলে নরম থেকে পাতলা মল নির্গত হয় এবং মলের সাথে মিউকাস এবং কখনো কখনো রক্ত নির্গত হয়। এক্ষেত্রে পেট কামড়ানোর মতো ব্যথা অনুভূত হয়।

পথ্যের ধরন

- ডায়রিয়া হলে পাতলা পায়খানার কারণে শরীরে পানি ও লবণের ঘাটতি পূরণ করার জন্য প্রতিবার পায়খানার পর খাওয়ার স্যালাইন দিতে হবে। প্রয়োজনে চালের গুঁড়ার স্যালাইন রান্না করে খেতে দিতে হবে। এতে করে প্রয়োজনীয় পানি ও লবণের ঘাটতি খুব সহজেই পূরণ হবে। স্যালাইন না খেলে ডায়রিয়াজনিত কারণে ডিহাইড্রেশন হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।
- যেসব শিশু মায়ের দুধ খায় তারা কোনো অবস্থাতেই মায়ের দুধ খাওয়া বন্ধ করবে না, বরং মায়ের দুধের পাশাপাশি স্যালাইন চলবে।
- ডায়রিয়া ও আমাশয়ের প্রকোপ খুব বেশি না হলে স্বাভাবিক খাবার খাওয়া যাবে এবং পাশাপাশি স্যালাইন ও ওষুধ খেতে হবে।

- ডায়রিয়ার প্রকোপ খুব বেশি হলে অর্থাৎ তীব্র হলে স্বাভাবিক খাবার দেওয়া বাদ দিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই চালের গুঁড়ার স্যালাইন রান্না করে খেতে দিতে হবে। অন্যান্য খাবারের মধ্যে খুব নরম ভাত, ডিমের সাদা অংশ, কলা, ডাবের পানি দেওয়া যাবে।
- কাঁচা কলা ও পাকা কলা আমাশয়ের ও ডায়রিয়ার রোগীর জন্য ঔষধি সবজি ও ফল হিসেবে পরিচিত। এগুলো আমাশয় ও ডায়রিয়ায় উপকারি ভূমিকা পালন করে। এছাড়া থানকুনির পাতায় আমাশয়ের রোগীর জন্য ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে।



থানকুনি পাতা

চালের গুঁড়ার
স্যালাইন

কাঁচা কলা ও পাকা কলা



ডাব

ডায়রিয়ায় যে খাবার বাদ দেওয়া উচিত

- এক্ষেত্রে দুধ, তৈলাক্ত খাদ্য, ডাল, বাদাম, খুব বেশি আঁশযুক্ত শাকসবজি ও ফল, এছাড়াও শুকনা ফল, মিষ্টি ও মসলাযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে।
- সফট ড্রিংকস, ফলের ঘন রস।
- ডিপ ফ্রায়েড খাবার যেমন- সিংগারা, সমুচা, চিকেন ফ্রাই ইত্যাদি।
- বেকারির খাবার যেমন- পেস্ট্রি, ক্রিম কেক ইত্যাদি।

কাজ ১- কেউ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে সর্বপ্রথম তুমি কী খাওয়ার জন্য বলবে এবং কেন বলবে?

পাঠ ৩- উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে পথ্য

উচ্চ রক্তচাপে পথ্য- অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন, বংশগত কারণ, ওজনাধিক্য, বিপাকীয় ত্রুটি ইত্যাদি কারণে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে। ওষুধের পাশাপাশি যথাযথ নিয়ন্ত্রিত খাদ্য গ্রহণ ও নিয়মিত পরিশ্রম বা ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের ওজন স্বাভাবিক রাখা এবং নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করাই উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসার অর্থাৎ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সবচেয়ে উত্তম উপায়।

পথ্যের ধরন

- বেশি আঁশযুক্ত খাদ্য যেমন- ফল ও শাকসবজি বিশেষ করে টকজাতীয় ফল যেমন- লেবু, জাম্বুরা, কমলা, আনারস ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।
- কচি ডাবের পানি উপকারী।

- ভাত ও রুটি এবং চাল ও আটার তৈরি খাবার প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে বেশি খাওয়া যাবে না।
সাদা চাল ও সাদা আটার চেয়ে লাল চালের ভাত ও গমের ভুঁসিসহ আটার রুটি বেশি উপকারী।
- মাছ, চর্বিছাড়া মাংস, ডিম প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাওয়া যাবে।
- ডাল, বাদাম খাওয়া যাবে।
- ননী তোলা দুধ ও এই দুধের তৈরি টক দই খাওয়া।
- রান্নায় লবণ কম দিতে হবে এবং খাওয়ার সময় বাড়তি লবণ খাওয়া যাবে না।



উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীর জন্য উপকারী খাদ্য

যে খাবার বাদ দেওয়া উচিত

- বেশি লবণযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে। যেমন- পনির, আচার-চাটনি, সস, চিপস্, চানাচুর ইত্যাদি।
- লবণে সংরক্ষিত যেকোনো খাবার, যেমন- নোনা ইলিশ, টিনজাত মাছ ইত্যাদি।
- মাখন, ঘি, ডালডা, নারকেল ও বেশি তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাদ্য।
- চর্বিযুক্ত মাংস ও এদের তৈরি খাদ্য।
- ফাস্ট ফুড যেমন- চিকেন ফ্রাই, পিজ্জা, মাংসের তৈরি নাগেট ইত্যাদি।
- বেকারির খাবার যেমন- বিস্কুট, পেস্টি, ক্রিম কেক ইত্যাদি।
- সফট ড্রিংকস ও এনার্জি ড্রিংকস, ডার্ক কফি ইত্যাদি।
- সালাদে লবণ ও সালাদ ড্রেসিং বাদ দিতে হবে এবং সয়াসস, চায়নিজ লবণ বা টেস্টিং সল্ট বাদ দিতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপন করা সম্ভব হয়, আর নিয়ন্ত্রণে না রাখলে কিডনি নষ্ট হওয়া, স্ট্রোক হওয়া ও হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

ডায়াবেটিসে পথ্য- বংশগত কারণ, অতিরিক্ত শারীরিক ওজন, অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন ইত্যাদি কারণে শরীরে ইনসুলিন হরমোনের অভাব ঘটলে ডায়াবেটিস হয়। একবার ডায়াবেটিস হলে তা একেবারে সেরে যায় না, তবে নিয়ম মেনে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোনোভাবেই ডায়াবেটিস

নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। ডায়াবেটিস হলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই গ্লুকোজ প্রধানত খাবার থেকে আসে। কিছু কিছু খাবার আছে যা খাওয়ার পর খুব দ্রুত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়, সেই খাবারগুলো পরিহার করতে হবে। আবার কিছু খাবার আছে খাওয়ার পর খুব দ্রুত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ না বাড়লেও সেই খাবারগুলো পরিমাণে বেশি খেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাই সেই খাবারগুলো হিসাব করে খেতে হবে। আবার যে খাবারগুলোতে প্রচুর আঁশ আছে সেই খাবারগুলো বেশি খেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়বে না, তাই সেগুলো বেশি করে খাওয়া যাবে।

পথ্যের ধরন

- বেশি খাওয়া যাবে বা ইচ্ছামতো খাওয়া যাবে- সব রকমের শাকসবজি যেমন- চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, পেঁপে, পটল, শিম, লাউ, শসা, খিরা, করল্লা, উচ্ছে, কাঁকরোল, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি। ফলের মধ্যে জাম, জামরুল, আমলকী, লেবু, জাম্বুরা ইত্যাদি।
- হিসাব করে খেতে হবে- ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, খৈ, বিস্কুট, আলু, মিষ্টিআলু, মিষ্টিকুমড়া, দুধ, ছানা, পনির, মাংস, মাছ, ডিম, ডাল, বাদাম, মিষ্টি ফল যেমন- কলা, পাকা আম, পাকা পেঁপে ইত্যাদি। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও সাদা চাল ও সাদা আটার চেয়ে লাল চালের ভাত ও ভুসিসহ আটার রুটি বেশি উপকারি। ডায়াবেটিসে দ্রুত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায় না।
- পরিহার করতে হবে- চিনি, গুড়, মিছরি, রস, শরবত, সফট ড্রিংকস, জুস, সব রকমের মিষ্টি, পায়ের, ফ্রীজ, পেস্টি, কেক ইত্যাদি।



ডায়াবেটিক রোগীর জন্য উপকারী খাদ্য

- কাজ ১- ডায়াবেটিস হলে যে খাবারগুলো রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায় সেগুলোর একটা তালিকা করো।
কাজ ২- হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের রোগীদের কী ধরনের চাল ও আটা খাওয়ার পরামর্শ দেবে?

পাঠ ৪- হৃদরোগ ও জন্ডিসে পথ্য

হৃদরোগে পথ্য- আমাদের দেশে দিনদিনই হৃদরোগীর সংখ্যা বাড়ছে। হৃদরোগীর খাদ্য এমন হতে হবে যাতে করে রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশক্তির চাইতে বেশি খাদ্যশক্তি গৃহীত না হয় ও খাদ্য সুষম হয়। খাদ্যের মাধ্যমে চিনি, লবণ ও ফ্যাটের গ্রহণ যেন কম থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে আঁশ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা হয়।

পথ্যের ধরন

- লাল চালের ভাত ও ভুসিসহ আটার রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত হতে হবে এবং চাল ও আটার তৈরি খাবার প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে বেশি খাওয়া যাবে না।
- বেশি আঁশযুক্ত খাদ্য যেমন- ফল ও শাকসবজি বিশেষ করে টকজাতীয় ফল যেমন- লেবু, জাম্বুরা, কমলা, আনারস ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে।
- বিভিন্ন রঙিন সবজি যেমন- সবুজ (শাকপাতা), কমলা (মিষ্টিকুমড়া/গাজর), বেগুনি (বিট), লাল (টমেটো), হালকা হলুদ-সাদা (মুলা, শসা) রঙের এবং মৌসুমি তাজা শাকসবজি প্রতিদিন খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।
- ডাল, বাদাম পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে।
- মাছ, চর্বিছাড়া মাংস, চামড়া ছাড়া মুরগির মাংস, ডিম প্রয়োজনীয় পরিমাণে খেতে হবে।
- ননী তোলা দুধ ও এই দুধের তৈরি টক দই খাওয়া ভালো।
- রান্নায় লবণ কম দিতে হবে এবং খাওয়ার সময় বাড়তি লবণ খাওয়া যাবে না।



হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর জন্য উপকারী খাদ্য

যে খাবারগুলো বাদ দেওয়া উচিত

- মাখন, ঘি, ডালডা, ক্রিম সস, নারকেল ও বেশি তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাদ্য
- আইসক্রিম, মিষ্টি জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি
- বেশি চর্বিযুক্ত মাংস, কলিজা, হাঁস-মুরগির চামড়া ও এদের তৈরি খাদ্য
- বেশি লবণযুক্ত বা লবণে সংরক্ষিত যেকোনো খাবার, যেমন- পনির, আচার, চাটনি, সস, সয়াসস, চিপস্, চানাচুর, লবণযুক্ত বাদাম, নোনা ইলিশ, টিনজাত মাছ ইত্যাদি
- ফাস্ট ফুড যেমন- চিকেন ফ্রাই, পিজ্জা, মাংসের তৈরি নাগেট ইত্যাদি

- বেকারির খাবার যেমন—বিস্কুট, পেস্ট্রি, কেক ইত্যাদি
- সফট ড্রিংকস ও এনার্জি ড্রিংকস, ডার্ক কফি ইত্যাদি
- সালাদে লবণ ও সালাদ ড্রেসিং বাদ দিতে হবে
- স্বাদ লবণ (টেস্টিং সল্ট) বাদ দিতে হবে।

জন্ডিসে পথ্য— জন্ডিস নিজে কোনো রোগ নয় তবে এটা লিভারের কোনো রোগের লক্ষণ। এই লক্ষণ প্রকাশ পেলে সেই ব্যক্তির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনযুক্ত এবং কম পরিমাণ ফ্যাটযুক্ত পথ্য দিতে হবে। জন্ডিসে অনেকেরই হজমের সমস্যা দেখা যায়। সেক্ষেত্রে লঘুপাক খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। হজমের কোনো সমস্যা না থাকলে উচ্চ চর্বি বা ফ্যাটযুক্ত খাবার পরিহার করে বাকি সব ধরনের খাবার খাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন জন্ডিস হলে হালুদযুক্ত তরকারি খাওয়া যায় না, এটা সম্পূর্ণই ভুল ধারণা। আবার অনেকে জন্ডিস হলে স্বাভাবিক খাবার একেবারে বন্ধ করে দিয়ে শুধু আখের রস, পানি আর শরবত দিয়ে থাকেন—এটাও সঠিক নয়। জন্ডিসে পর্যাপ্ত পরিমাণে তরলজাতীয় খাবার খেতে হবে তবে চর্বিযুক্ত খাদ্য ও কৃত্রিম খাদ্যগুলো পরিহার করে সব খাবারই প্রয়োজন অনুযায়ী খাওয়া যাবে। নিচে জন্ডিস রোগীর পথ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো।

পথ্যের ধরন

- উচ্চ শক্তিদায়ক, উচ্চ প্রোটিনযুক্ত, কম চর্বি বা ফ্যাটযুক্ত খাবার দিতে হবে।
- জন্ডিসে সব খাবারই খাওয়া যাবে। তবে হজমে সমস্যা হলে লঘুপাক খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।
- হজমে সমস্যা হলে নরম ভাত, খিচুড়ি বা পিশপাশ, নরম ও অল্প আঁশযুক্ত সবজি, পেঁপে, আলু ইত্যাদি দেওয়া যায়। এছাড়া সুজি, নরম পুডিং এবং ফলের মধ্যে কলা, পেঁপে, কমলা, আপেল ইত্যাদি দেওয়া যায়।
- প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য দুধ, ডিম, কম তেলযুক্ত মাছ, মুরগি ও ডাল দেওয়া যায়।
- যথেষ্ট পরিমাণে পানীয় যেমন— দুধ, শরবত, ফলের রস, ডাবের পানি, সুপ ইত্যাদি খেতে হবে।
- টরজাতীয় ফল যেমন— আমলকী, লেবু, জাম্বুরা ইত্যাদি দিতে হবে।

পরিহার করতে হবে

- মাখন, ঘি, চর্বি ও বেশি তৈলাক্ত খাদ্য।
- ডিপ ফ্রায়েড খাবার যেমন সিংগারা, সমুচা, চিকেন ফ্রাই ইত্যাদি।
- বেকারির খাবার যেমন— পেস্ট্রি, ক্রিম কেক ইত্যাদি।
- সফট ড্রিংকস ও এনার্জি ড্রিংকস।

কাজ ১— রুদ্রোগীর জন্য বর্জনীয় খাবারগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

কাজ ২— জন্ডিস হলে কোন খাবার বাদ দিতে হবে?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোন রোগের কারণে ডিহাইড্রেশন হয়?

ক. উচ্চ রক্তচাপ	খ. জ্বর
গ. ডায়রিয়া	ঘ. ডেঙ্গু
২. ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে কোনটি উপযোগী?

ক. ডাল	খ. বাদাম
গ. শিম	ঘ. মিষ্টিকুমড়া

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

খাবারের প্রতি রিমোর অরুচি ও বমি বমি ভাব লক্ষ করে রিমোর মা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি দেখলেন রিমোর চোখ ও প্রস্রাবের রং হলুদ হয়েছে। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে তিনি তখন রিমোর জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করেন।

৩. রিমোর কোনো রোগটি হয়েছে?

ক. ডায়রিয়া	খ. জন্ডিস
গ. আমাশয়	ঘ. ডায়াবেটিস
৪. রিমোর জন্য উপযুক্ত পথ্য কোনগুলো?

ক. শরবত, ফলের রস ও ডাবের পানি	খ. সিংগারা, সমুচা ও চিকেন ফ্রাই
গ. মাছ, মাংস ও ডিম	ঘ. বিস্কুট, কেক ও সফট ড্রিজ্জস

সৃজনশীল প্রশ্ন :

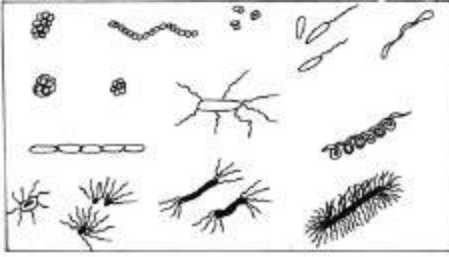
১. পুষ্পার শাশুড়ি বেশ কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ। তিনি ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। পুষ্পা তার শাশুড়িকে প্রয়োজনীয় সব ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে তিনি শাশুড়ির আবদার রক্ষার জন্য ক্ষীরের পাটিসাপটা পিঠা তৈরি করে খেতে দেন। পুষ্পার স্বামী তা দেখে পুষ্পাকে তাঁর মায়ের খাবারের প্রতি আরও সচেতন হতে বলেন।

ক. পথ্য কী?	খ. পথ্যের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।
গ. পুষ্পার তৈরি করা খাবারটি শাশুড়ির উপর কীরূপ প্রভাব ফেলবে, ব্যাখ্যা করো।	ঘ. উপযুক্ত পথ্য পুষ্পার শাশুড়ির রোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে-উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

একাদশ অধ্যায় খাদ্য সংরক্ষণ

খাদ্য সংরক্ষণ বলতে বোঝায় খাদ্য যাতে পচে নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে খাদ্যের গুণগত মান অনুসারে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে মজুদ রাখা।

বিভিন্ন মৌসুমে উৎপাদিত শাকসবজি, ফলমূল, শস্য যেমন— চাল, গম, ডাল, সরিষা ইত্যাদি চাহিদা মেটানোর পর উদ্ভূত অংশ অবিকৃত অবস্থায় দীর্ঘ দিন খাওয়ার উপযোগী রাখার জন্য বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। অর্থাৎ শাকসবজি, ফলমূল, শস্যাদানা ইত্যাদি খাওয়ার বা বিক্রির জন্য সঞ্চয় করে রাখা যায়। ভবিষ্যতের জন্য উদ্ভূত খাদ্যসামগ্রীকে নষ্ট করা বা অপচয় করা থেকে রক্ষা করে রাখাই খাদ্য সংরক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য।



১. অনুজীব



২. দ্রুত পচনশীল খাদ্য



৩. ফ্রিজ

পাঠ ১— খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

শস্য মানুষের প্রধান খাদ্য বলে অনেকদিন পর্যন্ত কেবল শস্যই সংরক্ষণ করা হতো। ফ্রিজ, হিমাগারের মতো প্রযুক্তি উন্নতির সাথে সাথে আজ ফলমূল, শাকসবজি, মাছ-মাংস ইত্যাদিও সংরক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যেসব খাদ্য সংরক্ষণ করা যায় সেগুলো হলো—

- শস্য ও শস্য জাতীয় খাদ্য।
- সবজি, ফলমূল এবং সবজি ও ফলের তৈরি খাদ্য।

- মাছ ও মাংস এবং মাছ ও মাংসের তৈরি খাদ্য।
- দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য।

খাদ্য সংরক্ষণের ধরন নির্ভর করে খাদ্যের পচনশীলতা প্রকৃতির উপর। তাই দ্রুত পচনশীল, প্রায় পচনশীল এবং অপচনশীল খাদ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

এখন আমরা খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা জেনে নেই—

- সংরক্ষণের মাধ্যমে এক মৌসুমের ফসল অন্য মৌসুমের জন্য সংরক্ষণ করে খাদ্যের চাহিদা ও অভাব মিটানো যায়।
- ঋতুকালীন সবজি ও ফল সংরক্ষণ করে অপচয় রোধ করার পাশাপাশি খাদ্য ঘাটতি মেটানো যায়।
- সংরক্ষণের মাধ্যমে সারাবছর ধরে বিভিন্ন মৌসুমের শস্য, শাকসবজি, ফলমূল সহজলভ্য করা সম্ভব।
- দেশের সব অঞ্চলে সব ধরনের খাদ্যশস্য, সবজি, ফলমূল উৎপন্ন হয় না। যথাযথ উপায়ে শস্য-ফলমূল, সবজি সংরক্ষণ করে সারা দেশে সরবরাহ করা সম্ভব।
- খাদ্য সংরক্ষণ করা হলে খরা, মহামারি, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদেরকে খাদ্যের অভাব, অপুষ্টি থেকে রক্ষা করা যায়।
- এছাড়া যুদ্ধ কিংবা অন্য কোনো কারণে অস্থিতিশীলতার সময় সৃষ্ট খাদ্য ঘাটতি, দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।
- মাছ-মাংস, ফলমূল ইত্যাদি খাদ্য টিনে সংরক্ষণ করে বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

কাজ ১— খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

পাঠ ২— পচনশীলতার ভিত্তিতে খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ

কৃষক রজব আলী জীবন ও জীবিকার তাগিদে সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের ফসল যেমন— ধান, ডাল, গম, আলু, সরিষা, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, জিরা, ধনে ইত্যাদি চাষ করেন। বিভিন্ন মৌসুমে আবাদ করেন টমেটো, আনারস, তরমুজ, বাজি ইত্যাদি বাহারি ফল। বছর জুড়েই মরিচ, শাকসবজি, ফলমূল ফলান। এছাড়া খামারে গরু ও হাঁস মুরগি পালন করেন, পুকুরে চাষ করেন মাছ। উৎপাদনকালীন এসব খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেলেও যথাযথ উপায়ে সংরক্ষণের অভাবে ও পচনশীলতার কারণে এক সময় আবার দুর্লভ হয়ে পড়ে। ফলে মৌসুম ছাড়া অন্য সময়ে পরিবারের ন্যূনতম চাহিদা ও মেটানো সম্ভব হয় না।

তাই পচনশীলতার ধরন যাচাই করে উপযুক্ত উপায়ে এসব খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ করা দরকার। যাতে সারাবছর এই খাদ্যগুলো দিয়ে নিজেদের চাহিদা মেটানো যায়।

সংরক্ষণ যোগ্য সব খাদ্যবস্তুকে পচনশীলতার প্রকৃতি ও মাত্রা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা –

- ক) দ্রুত পচনশীল বা সহজে পচনশীল খাদ্য
- খ) প্রায় পচনশীল খাদ্য
- গ) অপচনশীল খাদ্য

ক) দ্রুত পচনশীল বা সহজে পচনশীল খাদ্য

কোনো কোনো খাদ্য অতিদ্রুত অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পচন ধরে নষ্ট হয়। এসব খাদ্যে পানির পরিমাণ বেশি থাকে। সেজন্য যত্ন না নিলে খুব দ্রুত পচে যায়। যেমন– মাছ, মাংস, দুধ, টমেটো, শাক ইত্যাদি। দ্রুত পচনশীল খাদ্য ফুটিয়ে, রেফ্রিজারেটরে রেখে বা বরফে জমিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।



খ) প্রায় পচনশীল খাদ্য–



প্রায় পচনশীল খাদ্য

কোনো কোনো খাদ্য স্বাভাবিক অবস্থায় রেখেও কয়েক দিন ধরে খাওয়া যায়। কিছু সবজি যেমন – চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, কচু, আলু ইত্যাদি, কিছু কিছু ফল যেমন– চালতা, পেয়ারা, বড়ই, জলপাই ইত্যাদি এবং ডিম, আদা, রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি। এগুলোতে দ্রুত পচনশীল খাদ্যের চেয়ে পানির পরিমাণ কিছু কম থাকে বলে ঘরের ঠান্ডা আবহাওয়া, তাপ ও আলো থেকে দূরে রেখে কয়েক দিন ব্যবহার করা যায়।

গ) অপচনশীল খাদ্য

চাল, ডাল, গম, শূকন মরিচ, হলুদ, জিরা, সরিষা ইত্যাদি খাদ্যগুলোতে পানির পরিমাণ নেই বললেই চলে সঠিকভাবে এই খাদ্যগুলোকে ঝেড়ে বেছে, রোদে শুকিয়ে উপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষণ করা হলে অনেকদিন ধরে খাওয়া যায়।



অপচনশীল খাদ্য

কাজ ১- দ্রুত পচনশীল ও অপচনশীল খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি করো।

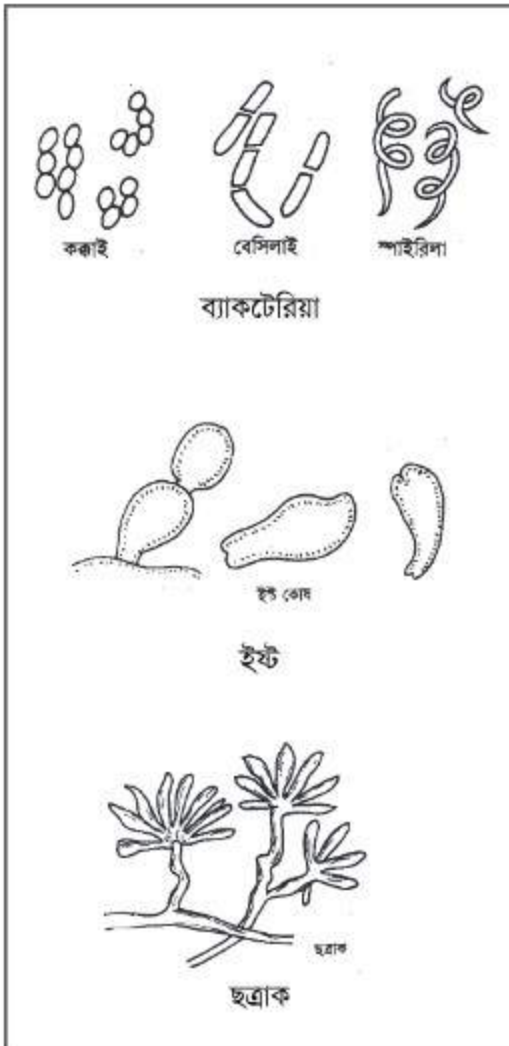
পাঠ ৩- খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ

কোনো খাদ্যই স্বাভাবিকভাবে অনেকদিন ধরে ঘরে রাখা যায় না। যেমন-ফল, সবজি নরম হয়ে যায়, খোসা কুঁচকে যায়, কালো দাগ পড়ে, চিতি পড়ে, দুর্গন্ধ বের হয় ইত্যাদি। মাছ, মাংস পচে নষ্ট হলে উপরিভাগ পিচ্ছিল হয়। পচা মাছের চোখ ঘোলা হয়ে বসে যায়, পেটের নাড়িভুঁড়ি গলে যায় ফলে আঙুল দিয়ে চাপ দিলে পেট ভেতরে বসে যায়, আঁশ টিলা ও কানকা ফ্যাকাসে হয়। ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ডিমও নষ্ট হয়। শূকনো খাদ্য, চাল, ডালে ছত্রাক জন্মায় এবং পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। একইভাবে রান্না করা খাদ্যে গাঁজন হয়, বুদবুদ ওঠে, টক গন্ধের সৃষ্টি হয়। তাই ঘরে রাখতে হলে খাবারকে পচনের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর সেজন্যই খাবার কেন নষ্ট হয় সে সম্বন্ধে পুরোপুরি জ্ঞান থাকা দরকার।

খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ:

১) অণুজীব

আমাদের চারদিকে বাতাসে, মাটিতে ও পানিতে ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গি, মোল্ড বা ছত্রাক ইত্যাদি অসংখ্য জীবাণু ছড়িয়ে আছে। এগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। অণুজীবের বেঁচে থাকা ও বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন খাদ্য, পানি, তাপ ও অক্সিজেন। সুযোগ পেলেই এগুলো খাদ্যে প্রবেশ করে এবং অনুকূল পরিবেশে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হয়ে খাদ্য দূষিত হয় এবং পচে গিয়ে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে।



উল্লেখযোগ্য অণুজীবগুলো হচ্ছে—

ক) ব্যাকটেরিয়া— ব্যাকটেরিয়া এককোষী জীব। মাছ-মাংস, শাকসবজি, ফল ইত্যাদি খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া জন্মায় এবং খাদ্য পচিয়ে ফেলে। আর্দ্রতায় ব্যাকটেরিয়া খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার জন্য উচ্চতাপ প্রয়োজন। শুষ্ক পরিবেশে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি লোপ পায়।

খ) ইফ— ইফ হচ্ছে এককোষ বিশিষ্ট অণুজীব যা পানি ও বাতাসের উপস্থিতিতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে খাদ্যকে নষ্ট করে। ইফের প্রভাবে শর্করা গাঁজো অ্যালকোহল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়। ইফ বাতাসের অভাবে বাঁচতে পারে না। উত্তাপ দিয়ে ইফ মেরে ফেলা যায়।

গ) ছত্রাক— ছত্রাক একজাতীয় উদ্ভিদ। উত্তাপ, আর্দ্রতা এবং বাতাসের উপস্থিতিতে কমলা, আম টমেটো, পনির, পাউরুটি, টক জাতীয় খাবারের উপর ছত্রাক জন্মায়। খাবারের উপর ছত্রাক ধূসর সবুজ বর্ণের আস্তরণ তৈরি করে। সাঁাতসেঁতে পরিবেশে শস্য ও চীনাবাদামে এক ধরনের বিষাক্ত ছত্রাক জন্মায় যা খেলে দেহে বিক্রিয়া দেখা দেয়। পানি ও আর্দ্রতায় ছত্রাক দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক, ঠান্ডা ও আলোযুক্ত স্থানে ও উচ্চ তাপে ছত্রাক জন্মায় না। রোদের তাপে ছত্রাক ধ্বংস হয়।

২) এনজাইম— এনজাইম উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের উপাদান। উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষে এনজাইম অনুঘটকের কাজ করে। এনজাইম ফল ও সবজি পাকাতে সাহায্য করে। এনজাইমের প্রভাবে ফল অতিরিক্ত পেকে নরম ও বোঁটাচ্যূত হয়। এভাবে খেতলানো ফল জীবাণুর আক্রমণে কালচে বর্ণ ধারণ করে। বিকৃত গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং নষ্ট হয়ে যায়। তাপ যত কম থাকে এনজাইমের কাজ তত কম হয়। ৮০° সে.-এর অধিক তাপে খাদ্য বস্তুকে উত্তপ্ত করলে এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়।

৩) রাসায়নিক বিক্রিয়া— ফল ও সবজির রাসায়নিক উপাদান 'এসিড' ও 'ট্যানিন' বাতাস ও পানির সংস্পর্শে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। এর ফলে খাদ্যের বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদের পরিবর্তন হয় এবং খাদ্য নষ্ট

হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া রোধ করতে হলে 0° সে. তাপমাত্রায় ফলমূল সংরক্ষণ করা ভালো। খাদ্য শুকিয়ে পানি সম্পূর্ণরূপে বের করলে রাসায়নিক বিক্রিয়া রোধ হয়। বোতলে বায়ুশূন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে ফলমূল সংরক্ষণ করলে রাসায়নিক বিক্রিয়া কম ঘটে।

৪) সংরক্ষণের অনুপযুক্ত স্থান – সংরক্ষণকৃত শুকনো খাদ্যদ্রব্য সঠিকভাবে যথাস্থানে রাখা না হলে ধুলা-ময়লা, ইঁদুর, পোকামাকড়ের আক্রমণে খাদ্যবস্তু আক্রান্ত হয়। পরবর্তী সময়ে জীবাণু ও ছত্রাক জন্মায় এবং খাদ্য নষ্ট হয়ে যায়।

কাজ ১- খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলো।

পাঠ ৪ – গৃহে খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি

আমরা প্রকৃতি থেকে যে খাদ্যগুলো পাই সেগুলো সবই পচনশীল। পচন ক্রিয়ার ফলে মানুষের উৎপাদিত খাদ্যসমূহ অনেকাংশে নষ্ট হয়। এই নষ্ট হওয়াকে রোধ করার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানা দরকার। আমরা বিভিন্নভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারি।

কুল, বরই, আম শুকিয়ে রাখা, নোনা ইলিশ, বিভিন্ন মাছের ও মাংসের শূটকি ইত্যাদি আমাদের দেশে প্রচলিত অতি পুরাতন সংরক্ষণ পদ্ধতি। এসব সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে মূলত খাদ্য থেকে পানি শুকিয়ে পচন রোধ করা হয়।

গৃহে খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে–

- এক মৌসুমের খাদ্য অন্য মৌসুমে খাওয়ার জন্য।
- উৎপাদিত বাড়তি খাদ্যের অপচয় রোধ করার জন্য।
- খাদ্যে জীবাণু ও এনজাইমের ক্রিয়া বন্ধ করা।
- খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বজায় রেখে খাদ্যের চাহিদা মেটানো।

গৃহে খাদ্য সংরক্ষণের কয়েকটি সাধারণ পদ্ধতি

রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ– মাছ-মাংস ও টাটকা শাকসবজির পানি প্রাকৃতিক উপায়ে রোদে শুকিয়ে নিতে পারলে পচন রোধ করা যায়। অনেকদিন ভালো থাকে। আলু, গাজর, বাঁধাকপি, মটরশুঁটি, কুল, বরই, আম, মাছ, মাংস সঠিক নিয়মে রোদে শুকিয়ে নিলে অনেক দিন খাওয়া যায়।

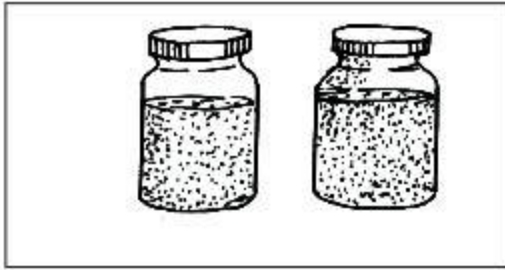
মাছ কীভাবে শুকাব

রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ



গুড় ও চিনিতে সংরক্ষণ— গুড়, চিনি খাদ্য সংরক্ষক দ্রব্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। গুড়ের সিরায় বরই, তেঁতুল, আম ইত্যাদি অনেকদিন রেখে খাওয়া যায়। চিনি দিয়ে চালকুমড়া, আম, বেল ইত্যাদির মোরবা বানিয়ে অনেকদিন খাওয়া যায়। স্বাদ-গন্ধ ঠিক রাখার জন্য মাঝে মাঝে রোদে দিতে হয়।

সিরকা ও তেলে সংরক্ষণ— সিরকার ও তেলে সবজি ও ফলমূল এবং মসলা সংরক্ষণ করা যায়। সিরকা বা ভিনেগার খাদ্যে জীবাণু বৃদ্ধি রোধ করে। যেমন— সবজি বা ফলের পিকেলস। হলুদ, মরিচ, জিরা, ধনে ইত্যাদি মসলা দিয়ে তেলে ডোবানো আচার অনেকদিন পর্যন্ত ভালো থাকে।

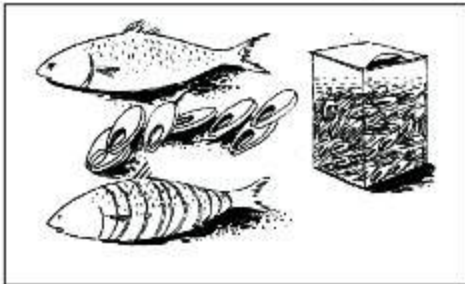


গুড় ও চিনিতে সংরক্ষণ (জেলি, মিষ্টি আচার)



সিরকা ও তেল সংরক্ষণ

লবণে সংরক্ষণ— লবণের দ্রবণ জীবাণু বৃদ্ধি রোধে বিশেষ উপযোগী।



লবণে সংরক্ষণ

খাদ্যে লবণ মাখলে জীবাণু কোষ থেকে পানি শুকিয়ে যায়। যেমন— ইলিশ মাছের কাটা টুকরা লবণ মাখিয়ে নোনা ইলিশ তৈরি হয়। কাঁচা আম, চালতা, আমলকী লবণ ও হলুদ মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে অনেকদিন রাখা যায়।

বরফে সংরক্ষণ— তাজা, টাটকা শাকসবজি পরিস্কার করে পানি ঝরিয়ে পলিথিনে মুড়ে ফ্রিজে রাখা হয় এবং যাতে ঘেমে না পচে সেজন্য পলিথিন ব্যাগে দুচারটি ফুটো করে দিতে হয়। তবে ফ্রিজের নিচের তাপমাত্রা



৪৫° ফা.-এর বেশি না হয়। ফ্রিজের যে চেম্বারে খাবার জমে বরফে পরিণত হয় তাকে ফ্রিজার বলে। এর তাপমাত্রা ১৮° সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর যে চেম্বারে খাবার বরফে পরিণত হয় না কিন্তু ঠান্ডা থাকে তাকে রেফ্রিজারেটর বলে। এই রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা ২° থেকে ৬° সে. পর্যন্ত হয়। দ্রুত পচনশীল খাদ্য যেমন— মাছ-মাংস, দুধ প্রভৃতি ফ্রিজারে রেখে দীর্ঘদিন রেখে খাওয়া যায়।

কাজ ১- খাদ্য সংরক্ষণের তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা সাধারণত কত সে. পর্যন্ত হয়?

- ক. ২° সে থেকে ৪° সে. খ. ৪° সে. থেকে ৬° সে.
গ. ৬° সে. থেকে ৮° সে. ঘ. ২° সে. থেকে ৬° সে.

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

খালেক মিয়া একজন ফল ব্যবসায়ী। তিনি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আম এনে বিক্রি করেন। এবার রাজশাহী থেকে আনা আমগুলো প্যাকিং ভালো না হওয়ায় অধিকাংশ আমই বিক্রির অনুপযোগী হয়ে যায়।

২. উদ্দীপকের ফলগুলো বিক্রয়ের অনুপযোগী হওয়ার জন্য দায়ী

- i. ব্যাকটেরিয়া
ii. ছত্রাক
iii. এনজাইম

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
গ. ii ও iii

- খ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৩. রাজশাহী থেকে আনা আমগুলো-

- ক. অ্যালকোহল সৃষ্টির জন্য সহায়ক
গ. এসিডের বিক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়
- খ. কালচে বর্ণ ধারণ করে
ঘ. পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.



চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র-৩

রমজান মাস এসে পড়ায় সুমাইয়া মাসিক ও সাপ্তাহিক বাজারের তালিকায় চিত্রের উল্লিখিত তিন প্রকার খাদ্যদ্রব্য রাখেন। বাজার থেকে ফিরে তিনি ২ নং চিত্রের খাদ্যগুচ্ছকে সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ১ নং ও ৩ নং চিত্রের খাদ্যগুচ্ছকে পরে গুছিয়ে রাখবেন বলে ঘরের একপাশে রেখে দেন।

- ক. কীরূপ পরিবেশে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি লোপ পায়?
খ. খাবারের উপর ছত্রাক ধূসর সবুজ বর্ণের আস্তরণ তৈরি করে- বুঝিয়ে লেখো।
গ. সুমাইয়ার ২ নং চিত্রের খাদ্যগুচ্ছের সংরক্ষণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের ১ নং ও ৩ নং চিত্রের খাদ্যগুলোকে স্বাভাবিকভাবে অনেক দিন ধরে রাখা সম্ভব কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।